Tyrannius Rufinus

Commentarius in Symbolum Apostolorum

লাতিন পাঠ্যের লিংক

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2022-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: 17 April 2022

Version 1.1 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

তিরান্নিউস রুফিনুস

প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

রুফিনুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’

প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের নানা পাঠ্য

প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

সূচনা

প্রেরিতদূতদের দ্বারা বিশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন

রোমের বিশ্বাস-সূত্র প্রৈরিতিক অধিকার দ্বারা চিহ্নিত

সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বাস করা প্রয়োজন

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর পিতৃত্ব

ঈশ্বর এক ও সর্বশক্তিমান

খ্রিষ্টের নামগুলো ও তাঁর ঐশপুত্রত্ব

কুমারী থেকে প্রভু যিশুর জন্ম

ক্রুশারোপণের অর্থ

যন্ত্রণাভোগের কথা পুরাতন নিয়মের ভাববাণীতে পূর্বঘোষিত

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান

স্বর্গারোহণ ও আসনগ্রহণ

পুনরাগমন ও বিচার

পবিত্র আত্মা

বাইবেলের পুস্তকাদির পবিত্র কানুন অনুযায়ী তালিকা

পবিত্র মণ্ডলী

পাপের ক্ষমা

মাংসের পুনরুত্থান

সমাপ্তি ও শেষ প্রার্থনা

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
পরমগীত (পরম গীত)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
হো (হোশেয়া)
জাখা (জাখারিয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

রুফিনুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশপ তিরান্নিউস রুফিনুস আনুমানিক ৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ইতালিতে, কঙ্কর্দিয়ায়, জন্মগ্রহণ করেন, যা সেকালে প্রখ্যাত আকুইলেইয়া ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটা ক্ষুদ্র শহর ছিল। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টিয়ান পিতামাতার সন্তান। উচ্চশিক্ষা লাভের লক্ষ্যে তাঁকে যৌবনকালে রোমে পাঠানো হয়। সময়মত তিনি বাড়ি ফিরে গিয়ে আকুইলেইয়ার একটা সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করেন, ও ৩৭২ সালে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। সেসময় তিনি সেই ধর্মপ্রদেশের একটি যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন যার নাম যেরোম, অর্থাৎ সেই যেরোম যিনি আজ সাধু যেরোম বলে পরিচিত। অল্প দিন পর, যখন যেরোম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান, তখন রুফিনুসও খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাস জীবনের জন্মস্থান সম্পর্কে অবগত হবার জন্য মিশর দেশে যাত্রা করেন।

৩৮০ সালে তিনি যেরুশালেমে গিয়ে জৈতুন পর্বতে একটা সন্ন্যাস আশ্রম স্থাপন করেন। ৩৮৬ সালে, যখন যেরোম বেথলেহেমে বাস করতে আসেন, তখন রুফিনুস তাঁর সঙ্গে আগেকার বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ৩৯৪ সালে যখন খ্রিষ্টমণ্ডলীতে অরিগেনেসের লেখাগুলোর ধর্মীয় নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন সেই ব্যাপারে সাধু যেরোম ও রুফিনুসের মধ্যকার বন্ধুত্ব ভেঙে যায়।

৩৯৮ সালে রুফিনুনুস আকুইলেইয়াতে ফিরে গিয়ে নানা ধর্মীয় পুস্তক অনুবাদে নিবিষ্ট থাকেন। ৪০৭ সালে তিনি আবার রোমে গিয়ে সেখানে একটা মঠে আশ্রয় নেন, কিন্তু যখন বর্বর জাতিগুলো ইতালি দখল করে, তখন তিনি সিসিলিতে পালিয়ে যান ও সেখানে, ৪১১ সালে, মৃত্যুবরণ করেন।

‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’

সাধু আগস্তিন, সাধু আম্ব্রোজ, সাধু বাসিল ইত্যাদি প্রখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদদের মধ্যে রুফিনুস স্থান পাননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি গ্রীক ধর্মপুস্তকগুলোর অনুবাদক বলেই একটা নাম অর্জন করে থাকেন। তাঁর নিজস্ব লেখা অল্প কয়েকটা মাত্র, আর ‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ পুস্তিকাটা সেগুলোর অন্যতম যা আজকালেও রুফিনুসের নাম উল্লেখযোগ্য করে তোলে।

যখন তিনি ৪০৪ সালে পুস্তিকাটা লেখেন, তখন বিশ্বাস-সূত্র সম্পর্কিত যথেষ্ট পুস্তিকা প্রচলিত ছিল। রুফিনুস বিশেষভাবে দু’টোর উপরেই নির্ভর করেন তথা, নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি লিখিত ‘ধর্মশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ’ ও যেরুশালেমের সাধু সিরিলের লিখিত ‘ধর্মশিক্ষা’। সাধু গ্রেগরির লেখা রুফিনুসের পুস্তিকার ১৪ ও ১৫ অধ্যায় প্রভাবান্বিত করে, এবং যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ‘ধর্মশিক্ষা’ এর ১৩-১৮ অধ্যায় রুফিনুসের পুস্তিকাটাকে প্রায় সর্বস্থানেই চিহ্নিত করে।

কিন্তু তবুও পুস্তিকাটার একটা স্বকীয়তা উল্লেখযোগ্য শুধু নয়, অধিক গুরুত্বপূর্ণই বলে স্বীকার্য, কেননা এ পুস্তিকা যদি না থাকত, তবে বিশ্বাস-সূত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আজও অন্ধকারই বিরাজ করত। কিন্তু এ পুস্তিকার মধ্য দিয়ে রুফিনুস সেকালের তিনটে বিশ্বাস-সূত্র উপস্থাপন করেন যেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঐশতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস-সূত্রের নেপথ্যে আদি বিশ্বাস-সূত্র যে কেমন হতে পারত তা জানতে পারেন; আরও, তিনি কতগুলো ভ্রান্তমতেরও বর্ণনা দেন যেগুলোকে প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করার জন্য সেকালের মণ্ডলীগুলো নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে বিশ্বাস-সূত্রের কয়েকটা বচন সাময়িকভাবে উপযোগী করে তুলেছিল।

কমপক্ষে একারণেই রুফিনুসের এই লেখা আজকালের ও ভাবীকালের তত্ত্ববিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হয়ে থাকবে।

প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের নানা পাঠ্য

যেমনটা উপরে বলা হয়েছে, নিজের পুস্তিকায় রুফিনুস সেকালে প্রচলিত তিনটে বিশ্বাস-সূত্র উল্লেখ করেন, তথা, তাঁর নিজের ধর্মপ্রদেশ আকুইলেইয়াতে প্রচলিত বিশ্বাস-সূত্র, রোম অঞ্চলে প্রচলিত বিশ্বাস-সূত্র, ও প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত বিশ্বাস-সূত্র। এগুলো ‘এক নজরে’ ও বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত।

তাছাড়া, আজকালে প্রচলিত সেই ‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্র’ও উপস্থাপন করা হবে যা রুফিনুসের পরবর্তীকালে স্থির করা হয়েছিল।

পাঠক / পাঠিকার সুবিদার্থেই প্রতিটি সূত্র ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত।

• এক নজরে আকুইলেইয়া ও রোমের বিশ্বাস-সূত্র :
(ডবল ক্লিক করলে চিত্রটা পুরো আকারে দেখা যেতে পারবে।)

৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে

আকুইলেইয়ার বিশ্বাস-সূত্র	রোমের বিশ্বাস-সূত্র
(১) আমি অদৃশ্য ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে ;	(১) আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে,
(২) এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস করি,	(২) এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস করি,
(৩) যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন,	(৩) যিনি পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন,
(৪) পন্তিউস পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন,	(৪) পন্তিউস পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন,
(৫) পাতালে অবরোহণ করলেন, তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,	(৫) তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,
(৬) স্বর্গে আরোহণ করলেন,	(৬) স্বর্গে আরোহণ করলেন,
(৭) পিতার ডান পাশে আসীন আছেন,	(৭) পিতার ডান পাশে আসীন আছেন,
(৮) সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।	(৮) সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।
(৯) আমি পবিত্র আত্মায়,	(৯) আমি পবিত্র আত্মায়,
(১০) পবিত্র মণ্ডলী,	(১০) পবিত্র মণ্ডলী,
(১১) পাপমোচন,	(১১) পাপমোচন,
(১২) এই মাংসের পুনরুত্থান বিশ্বাস করি।	(১২) মাংসের পুনরুত্থান বিশ্বাস করি।

• বিস্তারিত উপস্থাপনা :

১। **আকুইলেইয়ার** ‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্র’, যা নিচে (২ দ্রঃ) উল্লিখিত রোমের প্রাচীন বিশ্বাস-সূত্র থেকে উদ্গত, ও আকুইলেইয়ার প্রয়োজন অনুসারে নানা স্থানে সম্বর্ধিত হয়েছিল :

(১) Credo in Deo Patre omnipotente invisibili et impassibili ;
আমি অদৃশ্য ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে ;

(২) Et in Christo Jesu, unico Filio eius, Domino nostro,
এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস করি,

(৩) qui natus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine,
যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন,

(৪) crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus,
পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন,

(৫) descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis,
পাতালে অবরোহণ করলেন, তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,

(৬) ascendit ad cælos,
স্বর্গে আরোহণ করলেন,

(৭) sedet ad dexteram Patris,
পিতার ডান পাশে আসীন আছেন,

(৮) inde venturus est judicare vivos et mortuos;
সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

(৯) Et in Spiritu sancto,
এবং আমি পবিত্র আত্মায়,

(১০) sanctam ecclesiam,
পবিত্র মণ্ডলী,

(১১) remissionem peccatorum,
পাপের ক্ষমা,

(১২) huius carnis resurrectionem.
এই মাংসের পুনরুত্থান [বিশ্বাস করি]।

২। **রোমের প্রাচীন** ‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্র’। যেমনটা বলা হয়েছে, সেটার প্রকৃত লিপি না থাকায়, এখানে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা রুফিনুসের ব্যাখ্যা ভিত্তি করেই সঙ্কলন করা হয়েছে।

(১) Credo in Deum Patrem omnipotentem;
আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে,

(২) Et in Christum Jesum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস করি,

(৩) qui natus est de Spiritu sancto et Maria Virgine,
যিনি পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন,

(৪) qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,
পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন,

(৫) tertia die resurrexit a mortuis,
তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,

(৬) ascendit in cælos,
স্বর্গে আরোহণ করলেন,

(৭) sedet ad dexteram Patris,
পিতার ডান পাশে আসীন আছেন,

(৮) unde venturus est judicare vivos et mortuos;
সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

(৯) Et in Spiritum sanctum,
এবং আমি পবিত্র আত্মায়,

(১০) sanctam ecclesiam,
পবিত্র মণ্ডলী,

(১১) remissionem peccatorum,
পাপের ক্ষমা,

(১২) carnis resurrectionem.
মাংসের পুনরুত্থান [বিশ্বাস করি]।

৩। গ্রীক ভাষী প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত বিশ্বাস সূত্র, যেরুশালেমের সাধু সিরিলের সেই 'ধর্মশিক্ষা' অনুসারে, যার লাতিন পাঠ্য রুফিনুস নিজের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেন।

(১) Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem; factorem cæli et terræ, visibiliumque omnium et invisibilium.
আমরা এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায়,

(২) καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, Θεὸν ἀληθινὸν, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum; qui ex Patre genitus est Deus verus ante omnia sæcula; per quem omnia facta sunt.
এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, সত্যকার ঈশ্বর; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,

(৩) Εν σαρκί παραγενόμενον καὶ ἐνανθρωπήσαντα (ἐκ Παρθένου καὶ Πνεύματος Ἁγίου),
Qui in carne advenit, et inhumanatus est (ex Virgine et Spiritu sancto),
যিনি মাংসে আগমন করলেন ও (কুমারী থেকে ও পবিত্র আত্মা থেকে) মানুষ হলেন,

(৪) σταυρωθέντα καὶ ταφέντα,
Crucifixus et sepultus,
ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হয়ে

(৫) ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
Resurrexit tertia die,
তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন,

(৬) καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθίσαντα ἐν δεξιῶν τοῦ Πατρὸς,
Et ascendit in cælos, et consedit a dextris Patris,
স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন ;

(৭) καὶ ἐρχόμενον ἓν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Et venturus est in gloria, judicare vivos et mortuos : cuius regni non erit finis.
জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে আগমন করবেন ; তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।

(৮) καὶ εἰς ἓν Ἅγιον Πνεῦμα, τόν Παράκλετον, τὸ λαλῆσαν ἓν τοῖς προφήταις,
Et in unum sanctum Spiritum, Paracletum : qui locutus est in prophetis.
এবং আমরা এক-পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি], সেই সহায়ক, যিনি নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন।

(৯) καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοιας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
Et in unum baptisma pænitentiæ, in remissionem peccatorum.
এবং আমরা পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের এক-বাপ্তিস্মে,

(১০) καὶ εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν,
Et in unam sanctam catholicam Ecclesiam.
এক, পবিত্র, কাথলিক মণ্ডলীতে,

(১১) καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν,
Et in carnis resurrectionem,
মাংসের পুনরুত্থানে,

(১২) καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Et in vitam æternam.
ও অনন্ত জীবনে [বিশ্বাস করি]।

৪। **রোম মণ্ডলীর** ‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্র’, যা আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের († ৫৪২) লেখা থেকে উদ্ধৃত। আজকালে প্রচলিত বিশ্বাস-সূত্র প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই এটির সমান।

(১) Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem cæli et terræ ;
আমি স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে,

(২) Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে আমি বিশ্বাস করি,

(৩) qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হলেন, কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ ক’রে

(৪) passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ও সমাহিত হলেন,

(৫) descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
পাতালে অবরোহণ করলেন, তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,

(৬) ascendit ad cælos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
স্বর্গে আরোহণ করলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন,

(৭) inde venturus est iudicare vivos et mortuos ;
সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

(৮) Credo in Spiritum sanctum,
আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি,

(৯) sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী, পবিত্রজনদের সহভাগিতা,

(১০) remissionem peccatorum,
পাপের ক্ষমা,

(১১) carnis resurrectionem,
মাংসের পুনরুত্থান,

(১২) vitam æternam.
অনন্ত জীবন [বিশ্বাস করি]।

আকুইলেইয়ার প্রবীণ
তিরান্নিউস রুফিনুস লিখিত
প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

সূচনা

১। আমার ক্ষীণ কার্যক্ষমতাকে বহুজনের সমালোচনার হাতে তুলে দেওয়া যে বিপদমুক্ত ব্যাপার নয়, এবিষয়ে সচেতন হয়ে আমি, হে অতিবিশ্বস্ত বিশপ লরেন্স (ক), কিছুটা লিখতে তত আগ্রহীও নই, তত উপযোগীও নই। তথাপি যেহেতু আপনার পত্রে আপনি খ্রিষ্টের সাক্রামেন্তসমূহের খাতিরে, (এমন সাক্রামেন্ত যা আমি গভীরতম শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধা করি) কড়াকড়ি ভাবে (কথাটা আপনি অবশ্যই ক্ষমার চোখে দেখবেন) আমাকে চাপ দিচ্ছেন যেন আমি আপনার জন্য বিশ্বাস-সূত্রের পরম্পরাগত ও প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারে বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা লিখি, সেজন্য যদিও তেমনটা করে আপনি আমার উপরে এমন বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন যা বহন করা আমার শক্তির ঊর্ধ্বে (কেননা আমি প্রজ্ঞাবানের সেই বচন বিস্মৃত নই যা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলে 'ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য কথা বলাও বিপজ্জনক'), তবু আপনি যদি আমার জন্য প্রার্থনা করেন যাতে করে আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া আপনার সেই দাবি সহজ হয়ে ওঠে, তাহলে আমার নিজের কার্যক্ষমতাজনিত দম্ভের চেয়ে বরং আপনার প্রতি বাধ্যতাজনিত শ্রদ্ধার খাতিরেই আমি কিছুটা বলতে চেষ্টা করব। তথাপি, আমি যা লিখতে যাচ্ছি, তা সিদ্ধতাপ্রাপ্ত যারা তাদের চর্চার বিষয়বস্তু তত

নয়, বরং খ্রিষ্টে এখনও শিশু যারা তা তাদেরই ও শিক্ষানবিশদেরই শ্রবণযোগ্য বিষয়বস্তু বলে বিবেচিত হবে [খ]।

কেননা আমি দেখেছি, কোন না কোন প্রখ্যাত লেখক এবিষয়ে ইতিমধ্যে এমন কিছু প্রকাশ করেছেন যা ধর্মসম্মত ও সংক্ষিপ্ত। আর শুধু তা নয়, আমি জানি, ভ্রান্তমতপন্থী ফতিনুসও [গ] এবিষয়ে কিছু লিখেছে, কিন্তু পাঠকদের কাছে [বিশ্বাস-সূত্রের] বচনগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দেবার লক্ষ্যে নয়, বরং যা কিছু সরলভাবে ও সত্যের শরণে ব্যক্ত তা যেন তার নিজের ভ্রান্তমতের সমর্থনে টানতে পারে; অথচ পবিত্র আত্মা এমনটা ব্যবস্থা করেছিলেন যেন সেই বচনগুলোতে দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট বা অন্যান্য তত্ত্বের প্রতি সঙ্গতিহীন কোনো কিছুই অনুপ্রবেশ করা না হয়। বস্তুত বিশ্বাস-সূত্রের বচনগুলোতে এ নবীয় বাণী সার্থক হয়ে ওঠে যে, প্রভু *সমদর্শিতা বজায় রেখে বচনটা সম্পন্ন ও সংক্ষিপ্ত করবেন, কেননা প্রভু পৃথিবী জুড়ে সংক্ষিপ্ত বচন গড়বেন* [ঘ]। অতএব আমার প্রচেষ্টা হবে, প্রেরিতদূতদের বচনগুলো তাদের স্বীয় সরলতায় ফিরিয়ে আনা ও গুরুত্ব আরোপ করা, ও একই সময়ে তা-ই পূরণ করা যা আমার পূর্বসূরীরা অপূর্ণাঙ্গ রেখেছিলেন। কিন্তু আমি যা ‘সংক্ষিপ্ত বচন’ বলে চিহ্নিত করেছি, সেটার লক্ষ্য যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেজন্য আমি [মণ্ডলীর] আদিকাল থেকে অনুসন্ধান করব কিভাবে পরম্পরাটা মণ্ডলীগুলোর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল।

প্রেরিতদূতদের দ্বারা বিশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন

২। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ সম্প্রদান করে গেছিলেন যে, প্রভুর আরোহণের পরে, যখন

পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা প্রতিটি প্রেরিতদূতের উপরে আগুনের জিহ্বা বসল যাতে করে তাঁরা নানা ও বিবিধ ভাষায় কথা বলায় কোনও ভিনজাতি ও ভিন্ন কোনও ভাষা তাঁদের কাছে দুর্গম ও অগম্য না হয়, তখন প্রভু দ্বারা তাঁদের এমন আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তাঁরা আলাদা ভাবে আলাদা আলাদা দেশে প্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। যখন তাঁরা এক একজন অন্য অন্যজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে উদ্যত ছিলেন, তখন ভাবী বাণীপ্রচারের নিয়ম সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে একমত

হলেন, এক একজন অন্য অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পর পাছে এমনটা হয় যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসে আহূতদের কাছে তাঁরা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যক্ত করেন। সুতরাং সবাই একস্থানে একত্রিত হয়ে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তাঁরা, এক একজন যা যা উপযুক্ত মনে করছিলেন সেই সেই সূত্র উপস্থাপন করে তাঁদের ভাবী প্রচারের জন্য সংক্ষিপ্ত এ সূত্রমালা সুবিন্যস্ত করলেন, যেইভাবে একটু আগে বলেছিলাম। আর তাঁরা স্থির করলেন, এ সূত্রমালাকে নিয়মমাফিক শিক্ষা হিসাবে বিশ্বাসীদের কাছে প্রদান করা হবে [(ক)]।

বহু ও ন্যায়সঙ্গত কারণে তাঁরা এ সূত্রমালাকে 'সিম্বলুম' নাম দিতে ইচ্ছা করলেন [(খ)], কেননা গ্রীক ভাষায় 'সিম্বলোন' বলতে পরিচয়-চিহ্নও বোঝাতে পারে, এমন সূত্র-সংগ্রহও বোঝাতে পারে, অর্থাৎ শব্দটা এমন সংযোজন কর্ম বোঝায় যাতে নানা ব্যক্তি নিজ নিজ অবদান রাখে। প্রেরিতদূতেরা এক একজন যা যা উপযুক্ত মনে করছিলেন সেই অনুসারে নিজ নিজ বচন উপস্থাপন করায় এ সূত্রমালা ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই করেছিলেন। একই সময় সূত্রমালাকে 'পরিচয়-চিহ্ন' ও 'সঙ্কেত-বাক্য' বলা হয় কেননা প্রেরিতদূত পলের নিজের কথা অনুসারে ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর বিবৃতি অনুসারে [(গ)] সেসময় ভবঘুরে ইহুদীদের মধ্যে বহুজন নিজেদের খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত বলে মিথ্যা ভান করে কোন অর্থের লোভে বা পেটের খাতিরে প্রচার কর্মে বেরিয়ে পড়েছিল; তারা খ্রিষ্টনাম উচ্চারণ করত বটে, কিন্তু সঠিক পরম্পরাগত বচনগুলো প্রচার করত না। সেজন্য প্রেরিতদূতেরা এ সূত্রমালাকে প্রতীকচিহ্ন ও পরিচয়-চিহ্ন বলে স্থির করেছিলেন, যে কেউ খ্রিষ্টকে প্রৈরিতিক নিয়ম দ্বারা সত্যিকারে প্রচার করত, তাকে যেন সেই চিহ্ন দ্বারা চেনা যেতে পারত। পরিশেষে কথিত আছে তেমন কিছু গৃহযুদ্ধ কালেও দেখা যায়, কারণ যেহেতু অস্ত্রসজ্জা সদৃশ, ভাষা একই, ও যুদ্ধ-পদ্ধতিও এক, সেইজন্য, চালাকির কোনও অবকাশ যেন না হয়, এক এক সেনাপতি নিজ নিজ সৈন্যদের বিশিষ্ট একটা পরিচয়-চিহ্ন বা সঙ্কেত-বাক্য সম্প্রদান করেন যা লাতিন ভাষায় 'চিহ্ন' বা 'পরিচয়-চিহ্ন' বলা হয়, যাতে করে এমনটা ঘটলে যে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যার বিষয়ে সন্দেহ করা হয় সে কোন্ পক্ষের মানুষ, তাকে সঙ্কেত-বাক্য জিজ্ঞাসা করলে সে প্রকাশ করবে সে শত্রু নাকি মিত্র। আর এবিষয়ে পরম্পরাটা বলে চলে যে, এই কারণেই বিশ্বাস-সূত্র

কাগজে বা চামড়ায় লেখা হয় না, বরং তা বিশ্বাসীর অন্তরে রক্ষা করা হয়; তাতে একথা নিশ্চিত হবে যে, কেউই তা এমন কাগজ পড়ার মাধ্যমে শেখেনি যা দৈবাৎ অবিশ্বাসীদের হাতে পড়েছে, বরং লোকটা প্রেরিতদূতদের সম্প্রদান করা শিক্ষা থেকেই তা শিখেছে [ঘ]।

তাই, যেমনটা আগে বলেছিলাম, যখন প্রেরিতদূতেরা সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত ছিলেন, তখন তাঁরা বিশ্বাসে তাঁদের মতৈক্যের এ সঙ্কেত-চিহ্ন স্থির করেছিলেন; তাঁরা তো নোয়ার সেই সন্তানদের মত ব্যবহার করেননি, যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে পোড়া ইট ও আলকাত্রা দিয়ে এমন মিনার তৈরি করেছিল যার চূড়া আকাশে গিয়ে পৌঁছবে [ঙ]; না, তাঁরা জীবন্ত পাথর ও প্রভুর মণিমুক্তা দিয়ে এমন বিশ্বাসস্তম্ভ তৈরি করলেন যা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াবে, যাতে করে কোনও বাতাস তা টলাতে, কোনও বন্যাও তার ভিত কাটতে, বা কোনও ঝড়ঝঞ্ঝাও তা ঝাঁকাতে না পারে। তাই বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে যারা গর্বেরই সেই মিনার গেঁথেছিল, নোয়ার সেই সন্তানেরা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এলোমেলো ভাষা-শাস্তিতে দণ্ডিত হয়েছিল যার ফলে কেউই যেন নিজের প্রতিবেশীর কথা না বুঝতে পারে। অন্যদিকে যাঁরা বিশ্বাস-মিনার গাঁথতে যাচ্ছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের সমস্ত ভাষা জানতে ও বুঝতে দেওয়া হয়েছিল। এসমস্ত কিছু এমন, যাতে প্রথম আদর্শটা পাপেরই ও দ্বিতীয় আদর্শটা বিশ্বাসেরই প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

রোমের বিশ্বাস-সূত্র প্রৈরিতিক অধিকার দ্বারা চিহ্নিত

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই মণিমুক্তাগুলো ব্যাখ্যা করার সময় এসে গেছে। সেগুলোর প্রথম স্থানে সমস্ত কিছুর উৎস ও আদি তখনই বসানো হয় যখন আমরা বলি,

৩। **‘আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।’**

কিন্তু শব্দগুলোর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করার আগে আমি একথাই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি যে, নানা মণ্ডলীতে এ বচনে কোন না কোন অতিরিক্ত শব্দ পাওয়া যায়। তথাপি রোম শহরের মণ্ডলীতে তেমনটা দেখা যায় না [ক]; আমার

বিবেচনায়, এর কারণ হলো এই যে, একদিকে কোনও ভ্রান্তমত সেখানে কখনও উদ্ভূত হয়নি, এবং অন্যদিকে সেখানে সেই প্রাচীন নীতি রক্ষা করা হচ্ছে যা অনুসারে যারা বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে যাচ্ছে তারা প্রকাশ্যে অর্থাৎ বিশ্বাসী জনগণের কর্ণগোচরেই বিশ্বাস-সূত্রকে আবৃত্তি করতে বাধ্য (খ); তেমন কিছুর ফলে, যারা বিশ্বাসে ছিল তাদের পূর্বসূরী, তাদের কান সূত্রমালা আবৃত্তিকালে অতিরিক্ত একটামাত্র শব্দও মেনে নেয় না। কিন্তু, আমার জানা মতে, অন্যান্য স্থানে ভ্রান্তমতপন্থীদের উপস্থিতির ফলে এমনটা মনে হচ্ছে যে, অতিরিক্ত কোন না কোন বচন যোগ করা হয়েছিল যেগুলো দ্বারা এমনটা ধরে নেওয়া হচ্ছিল যে, ধর্মতত্ত্বের নবীন নবীন ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করা যেতে পারবে। আমার দিক দিয়ে আমি সেই সূত্রধারা পালন করতে যাচ্ছি যে ধারায় আকুইলেইয়া মণ্ডলীতে প্রক্ষালণের অনুগ্রহ গ্রহণ কালে (গ) আমি নিজেকে আবদ্ধ করেছিলাম।

সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বাস করা প্রয়োজন

[রুফিনুস বচনটা সেইভাবে ব্যাখ্যা করছেন যেভাবে তা লাতিন ভাষায় সাজানো তথা, ‘আমি বিশ্বাস করি সেই ঈশ্বরে যিনি সর্বশক্তিমান পিতা’]

অতএব, **‘আমি বিশ্বাস করি’** বচনটা সূত্রমালার অগ্রস্থানেই স্থান পাচ্ছে, সেইভাবে, যেভাবে প্রেরিতদূত পল হিব্রুদের কাছে লিখতে গিয়ে বলেন, *কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার প্রথমত বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন* (ঘ)। এবিষয়ে নবীও বলেন, *বিশ্বাস না করলে তোমরা বুঝতে পারবে না* (ঙ)। তাই যাতে বুঝবার প্রবেশপথ তোমার জন্য উন্মুক্ত হয়, সেজন্য তুমি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সর্বপ্রথমে স্বীকার কর যে, তুমি বিশ্বাস কর (চ)। কেননা এমন কেউই নেই যে সমুদ্রযাত্রায় পা বাড়ায় ও অতলান্ত ও তরল উপাদানের হাতে নিজেকে সঁপে দেয় যদি না আগে বিশ্বাস করে যে, সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। কৃষকও হলরেখায় বীজ সঁপে দেয় না ও ভূমি জুড়ে দানাগুলো ছড়িয়ে দেয় না যদি না বিশ্বাস করে যে, বৃষ্টি আসবে ও সেইসঙ্গে সূর্যের তাপও আসবে যার প্রভাবে ভূমি ফলাদি শতগুণে উৎপন্ন করবে ও বাতাসের সহায়তায় ফসল পরিপক্ক করবে। অবশেষে, জীবনে

এমন কিছুই করা যায় না যদি না আগে বিশ্বাস স্থান পেয়ে না থাকে। তাই এতে আশ্চর্যের কীবা আছে যদি ঈশ্বরের কাছে এগোতে গিয়ে সর্বপ্রথমে স্বীকার করি, আমরা বিশ্বাস করি, একথা ভেবে যে, এ বিশ্বাস ছাড়া সাধারণ জীবনও যাপন করা যায় না। আমি এ পূর্বশর্ত প্রথমেই স্থান দিয়েছি, কেননা বিধর্মীরা প্রায়ই এ অভিযোগ তোলে যে, যেহেতু আমাদের ধর্ম যুক্তিবিহীন, সেজন্য সেই ধর্ম কেবল বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে; এজন্যই আমি দেখিয়েছি যে, কিছুই করা যায় না ও কিছুই স্থির থাকতেও পারে না যদি না আগে বিশ্বাসের শক্তি স্থান পেয়ে না থাকে। তাছাড়া বিবাহও সম্পাদন করা হয় যেহেতু মানুষ বিশ্বাস করে, তা থেকে বংশ আসবেই; সন্তানদেরও স্কুলে পাঠানো হয় এবিশ্বাসে যে, শিক্ষকদের শিক্ষা ছাত্রদের কাছে সঞ্চিত হবে; এবং একটা মানুষ রাজকীয় চিহ্নাদি তুলে ধরে যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে, জাতিগুলো, শহরগুলো ও সামরিক শক্তিগুলোও তার বাধ্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু যখন এমন কেউই নেই যে এসমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একটামাত্রও হাতে নেয় না যদি না আগে সেটার শুভফলে বিশ্বাস না রাখে, তখন গুরুতর কারণে এ কি যুক্তিসঙ্গত নয় যে, মানুষ বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর-জ্ঞানে এসে পৌঁছবে? কিন্তু এসো, একটু দেখি বিশ্বাস-সূত্রের এ সংক্ষিপ্ত বচন কিনা উপস্থাপন করে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর পিতৃত্ব

৪। সূত্রটা বলে, **‘আমি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি’**। প্রায়ই সমস্ত প্রাচ্য মণ্ডলী বচনটা এভাবে উপস্থাপন করে, **‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায়, বিশ্বাস করি’**[ক]। একই প্রকারে, পরবর্তী বচনে যেখানে আমরা **‘এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে [আমি বিশ্বাস করি’]** বলে থাকি, তারা সেখানে **‘আমি আমাদের সেই এক-প্রভুতে, তাঁর একমাত্র পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি]’** বলে থাকে। অর্থাৎ, তারা প্রেরিতদূত পলের অধিকার অনুসারে [খ] **‘এক-ঈশ্বর’** ও **‘এক-প্রভুকে’** স্বীকার করে। কিন্তু বিষয়টা আমি পরবর্তী পদগুলোতে বার বার তুলে ধরব। আপাতত এসো, ‘সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে’ বচনটা লক্ষ করি।

মানব ধীশক্তি যতখানি ধারণা করতে পারে, সেই অনুসারে ‘ঈশ্বর’ হলেন সেই স্বরূপ বা সত্তার নাম যা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। ‘পিতা’ এমন শব্দ যা গুপ্ত ও অনির্বচনীয় রহস্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। যখন তুমি ‘ঈশ্বর’ কথাটা শোন, তখন তোমাকে এমন সত্তাকে বুঝতে হবে যা অনাদি অনন্ত, একক, যার সঙ্গে কিছুই যুক্ত নয়, অদৃশ্যমান, দেহবিহীন, অনির্বচনীয়, অমূল্য, যার এমন কিছু নেই যা তাতে যুক্ত বা সৃষ্ট করা হয়েছিল। কেননা সবকিছুর আদিকারণ যিনি, তিনি কারণবিহীন। যখন তুমি ‘পিতা’ কথাটা শোন, তখন তোমাকে এমন পুত্রেরই পিতাকে বুঝতে হবে যে পুত্র উপরোক্ত সত্তার প্রতিমূর্তি। কেননা যেমন কাউকেই ‘প্রভু’ বলা হয় না যদি না তার সম্পদ থাকে বা কোনও দাস থাকে যার উপরে সে প্রভুত্ব করে থাকে, এবং কাউকেও ‘শিক্ষক’ বলা হয় না যদি না তার একটা শিষ্য থাকে, তেমনি কাউকেও ‘পিতা’ বলা আদৌ সম্ভব নয় যদি না তার একটা পুত্র থাকে। সুতরাং ঈশ্বরকে যে নামে ‘পিতা’ বলে বলা হয়, তা দ্বারা এ প্রমাণিত হয় যে, পিতার সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে একটা পুত্রও বিদ্যমান আছেন।

তথাপি, পিতা ঈশ্বর কেমন করে পুত্রকে জনিত করলেন, আমি চাই না তুমি এবিষয়ে তর্কযুক্তি করবে, এও চাই না, তুমি কৌতূহলীভাবে অতলান্ত রহস্যে অনুপ্রবেশ করবে (গ) পাছে অগম্য আলোর বিভায় অতি আগ্রহের সঙ্গে নিরীক্ষা করতে গিয়ে তুমি সেই ক্ষীণ আভাস হারাবে যা ঈশ্বরের উপহারের খাতিরে মরণশীল মানুষকে মঞ্জুর করা হয়। অথবা, তুমি যদি মনে কর, বিষয়টা সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার যোগ্য, তাহলে আমাদের অবস্থার সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, আগে তেমন বিষয়ই নিজের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু বলে ধর, এবং তুমি তেমন বিষয়াদি সমাধান করতে সক্ষম হলে তবেই পার্থিব থেকে স্বর্গীয় বিষয়গুলোতে, ও দৃশ্যমান থেকে অদৃশ্যমান বিষয়গুলোতে ধাবিত হও। তুমি পারলে তবে প্রথমত ব্যাখ্যা কর সেই যে মন তোমার অভ্যন্তরে রয়েছে, কেমন করে সেই মন একটা শব্দ জনিত করে, এবং যে স্মৃতি তোমার মনের অভ্যন্তরে রয়েছে, সেই স্মৃতির আত্মা কী; এবং ব্যাখ্যা কর কীভাবে এসমস্ত কিছু বাস্তব ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও তবু স্বরূপে ও প্রকৃতিতে এক; এবং সেগুলো মন থেকে উদ্গত হলেও তবু মন থেকে কখনও পৃথক হয় না। আর যদি এসমস্ত কিছু আমাদের অভ্যন্তরে ও আমাদের নিজেদের আত্মার সত্তায় স্থিত হওয়া সত্ত্বেও তবু মনে হচ্ছে সেগুলো আমাদের কাছ থেকে

ততখানি গুপ্ত যতখানি আমাদের দৈহিক দৃষ্টিশক্তির কাছে অদৃশ্য, তাহলে এসো, আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হিসাবে তা-ই ধরি যা আমাদের কাছে একেবারে দৃষ্টিগোচর। কেমন করে উৎসটা নিজ থেকে একটা নদী উৎসারিত করে? কোন্ গুপ্ত প্রভাবেই বা সেটা বহন করা হয় যার ফলে সেটা একটা জলস্রোত হয়ে ওঠে? কেমনটা হয় যে, সেই নদী ও সেই উৎস এক ও অবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তবু নদীটা উৎস বলে গণ্য করা বা অভিহিত করা যায় না, এবং উৎসটাও নদী বলে অভিহিত করা যায় না, অথচ যে কেউ নদীটা দেখেছে সে উৎসটাও দেখেছে? হ্যাঁ, আগে এসমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত থাক, এবং যা কিছু তোমার হাতে রয়েছে, সক্ষম হলে তা-ই ব্যাখ্যা কর; তারপর সেই সবকিছুতে পদার্পণ কর যা ঊর্ধ্বতর বিষয়। তথাপি এমনটা মনে করো না, আমি ইচ্ছা করি তুমি এক নিমেষেই মর্ত থেকে স্বর্গে আরোহণ করবে; না, বরং তোমার অনুমতি ক্রমে আমি আগে তোমাকে এই আকাশপরদায় নিয়ে যেতাম যা চোখে দেখা যেতে পারে; আর সেখানে গিয়ে, তুমি সক্ষম হলে, এ দৃশ্যগত বাতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর: কেমন করে এই স্বর্গীয় আগুন নিজ থেকে আলোর দীপ্তি জনিত করে, সেই আগুন কেমন করে উত্তাপও উৎপাদন করে; আর বাস্তব ক্ষেত্রে তিনটে হলেও তথাপি এগুলো যে সত্তায় একক তাও ব্যাখ্যা কর। আর তুমি এসমস্ত কিছুর এক একটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সক্ষম হলে, কিন্তু তবুও তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে, ঐশ্বরিক প্রজনন রহস্যটা এসমস্ত কিছুর তুলনায় সেইভাবে ততখানি বেশি আলাদা ও ততখানি বেশি অতিক্রান্ত, যেভাবে স্রষ্টা সৃষ্টজীবদের তুলনায় যতখানি বেশি প্রভাবশালী, কর্তা নিজের কর্মের তুলনায় যতখানি শ্রেষ্ঠতর, ও সর্বকালীন বিদ্যমান যিনি তিনি সেই মানবের তুলনায় যতখানি উৎকৃষ্টতর যে মানব শূন্যতা থেকে বিদ্যমান হতে শুরু করল।

অতএব, ঈশ্বর যে তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের সেই প্রভুর পিতা, একথা তর্কযুক্তির বিষয় নয়, বিশ্বাসেরই বিষয়, কেননা নিজের প্রভুর জন্ম সম্পর্কে তর্কযুক্তি করা দাসের পক্ষে বিধেয় নয়। স্বর্গ থেকে পিতা নিজে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন* (ঘ)। পিতা বলছেন, তিনি তাঁর পুত্র ও তাঁর কথা শুনতে আমাদের আজ্ঞা করছেন। পুত্র বলেন, *যে আমাকে দেখে, সে পিতাকেও দেখে*; *আমি এবং পিতা, আমরা এক*; ও *আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি এবং*

এজগতে এসেছি (ঙ)। সেই মানুষ কোথায়, যে মানুষ পিতা ও পুত্রের মধ্যকার এবাণীর তর্কবিদ বলে অনুপ্রবেশ করবে, যে মানুষ ঈশ্বরত্বকে বিভক্ত করবে, সেই মঙ্গল ইচ্ছা বিযুক্ত করবে, সেই সত্তাকে ভেঙে দেবে, সেই আত্মাকে দীর্ণবিদীর্ণ করবে, ও সত্য নিজে যা বলেন তা যে সত্যাশ্রয়ী তা অস্বীকার করবে? অতএব ঈশ্বর হলেন সত্যকার পিতা যেহেতু তিনি সত্যের পিতা; তিনি পুত্রকে নিজের বাইরে থেকে সৃষ্টি করেন না বরং তিনি নিজে যা তা থেকেই তাঁকে জনিত করেন; অর্থাৎ, সর্বপ্রজ্ঞাবান বলে তিনি প্রজ্ঞাকে, ন্যায়বান বলে ন্যায়কে, সনাতন বলে সনাতনকে, অমর বলে অমরতাকে, অদৃশ্যমান বলে অদৃশ্যকে জনিত করেন। স্বয়ং আলো হওয়ায় তিনি দীপ্তিকে জনিত করেন, স্বয়ং মন হওয়ায় তিনি বাণীকে জনিত করেন।

ঈশ্বর এক ও সর্বশক্তিমান

৫। আচ্ছা, যখন আমি বলেছিলাম, প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো **‘এক-ঈশ্বর সেই সর্বশক্তিমান পিতা’** ও **‘সেই এক-প্রভু’** এর কথা সম্প্রদান করে থাকে, তখন সেই ‘এক’ সংখ্যা হিসাবে নয়, একক হিসাবেই ধরে নিতে হবে। উদাহরণ যোগে, একটা লোক যদি বলত, ‘একটা মানুষ’ বা ‘একটা ঘোড়া’, তাহলে এক্ষেত্রে সেই ‘এক’ সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত। কেননা এমনটা হতে পারত যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় একটা মানুষ বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় একটা ঘোড়া থাকত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিছুই যোগ করা যায় না, তখন আমরা যদি ‘এক’ বলি তখন আমরা সেই ‘এক’ সংখ্যা হিসাবে নয়, একক হিসাবেই ধরে নিই। উদাহরণ যোগে, আমরা যদি বলতাম ‘এক সূর্য’ তাহলে এক্ষেত্রে অর্থটা এ হত যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় একটা সূর্য যোগ করা যায় না যেহেতু একটামাত্র সূর্য রয়েছে। তাই ঈশ্বর ক্ষেত্রে এ যুক্তি আরও গুরুতর: যখন তাঁর বিষয়ে বলা হয় তিনি এক, বা তিনি ‘এক’ বলে অভিহিত হন, তখন আমরা শব্দটা সংখ্যা হিসাবে নয়, একক হিসাবেই ব্যবহার করি; অর্থাৎ কিনা, তাঁকে ‘এক’ বলে অভিহিত করা হয় যেহেতু কোনও দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই। একই প্রকারে প্রভু ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ধরে নিতে হবে, তথা তিনি এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যাঁর দ্বারা ও যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর সবকিছুর উপর অধিকার রাখেন।

এজন্য পরবর্তী বচন ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে চিহ্নিত করে। তাঁকে **‘সর্বশক্তিমান’** বলা হয় কারণ তিনি সবকিছুর উপরে অধিকার রাখেন। কিন্তু পিতা নিজের পুত্র দ্বারাই সবকিছুর উপর অধিকার রাখেন, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে —যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব— সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে* (ক)। আরও, হিব্রুদের কাছে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, *কারণ তিনি তাঁর দ্বারা যুগগুলো প্রতিষ্ঠা করলেন ও তাঁকে সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন* (খ)। তিনি তাঁকে ‘নিযুক্ত করলেন’ বলায় আমাদের তাঁকে ‘জনিত করলেন’ বুঝতে হবে। আচ্ছা, যখন পিতা তাঁরই দ্বারা যুগগুলো প্রতিষ্ঠা করলেন ও সবকিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হল, ও তিনি হলেন সবকিছুর উত্তরাধিকারী, তখন তাঁরই দ্বারা তিনি সবকিছুর উপরে অধিকার রাখেন। কেননা যেমন আলো আলো থেকে ও সত্য সত্য থেকে সঞ্জাত, তেমনি সর্বশক্তিমানও সর্বশক্তিমান থেকে সঞ্জাত যেইভাবে যোহনের ঐশপ্রকাশে সেরাফদূত সম্পর্কে লেখা রয়েছে, তথা, *তাঁরা দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু সেনাবাহিনীর ঈশ্বর, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন, সেই সর্বশক্তিমান* (গ)। তাই ‘যিনি আসছেন’ তাঁকে ‘সর্বশক্তিমান’ বলা হয়। আর ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট ছাড়া অন্য আর কেই বা আছে যার আসার কথা?

পূর্বোক্ত বচনে **‘অদৃশ্য’** ও **‘যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন’** শব্দ দু’টোও যুক্ত রয়েছে। এবিষয়ে আমাকে এ উল্লেখ করতে হবে যে, এ শব্দ দু’টো রোম মণ্ডলীর বিশ্বাস-সূত্রে স্থান পায় না। এ জানা কথা যে, শব্দ দু’টো আমাদের মণ্ডলীতে সাবেল্লিউসের সেই ভ্রান্তমতের খাতিরেই যোগ করা হয়েছিল যা ‘পাতৃপাসিও’ ভ্রান্তমত (ঘ) বলে অভিহিত, ও যা একথা সমর্থন করে যে, পিতা নিজেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, দৃশ্যমান হলেন, ও দেহে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন।’ তাই, পিতা সম্পর্কে তেমন ভক্তিবিরুদ্ধ ধারণা বাতিল করার লক্ষ্যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পিতাকে **‘অদৃশ্য’** ও **‘যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন’** বলে সেই শব্দ দু’টো যোগ করেছিলেন। কেননা একথা স্পষ্ট যে, পিতা নয়, পুত্রই মাংস হলেন, মানবদেহ থেকে জন্ম নিলেন, ও মাংসে তাঁর জন্মের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ হলেন। এবং পিতার সঙ্গে পুত্র যে অমর সত্তার উপর অধিকার রাখেন, ও যা পিতারই সমান ও একই অমর সত্তা, ঈশ্বরত্বের সেই অমর সত্তা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস করতে

হবে যে, পিতা বা পুত্র বা পবিত্র আত্মা কেউই দৃশ্যমান নন, যন্ত্রণাসাপেক্ষও নন। তথাপি যেহেতু পুত্র মাংসধারণ করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, সেই অনুসারেই তিনি দৃশ্যমান হলেন ও মাংসে যন্ত্রণাভোগ করলেন। একথা নবীও আগেই বলে দিয়েছিলেন যখন বলেছিলেন, *তিনি আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হবে না; তিনি সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথের সন্ধান পেলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে, ও তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের সঙ্গে কথোপকথন করলেন* [ঙ]।

খ্রিষ্টের নামগুলো ও তাঁর ঐশপুত্রত্ব

৬। পরবর্তী বচন বলে, **'এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমি বিশ্বাস করি'**। 'যিশু' হিব্রু একটা নাম যা আমরা 'ত্রাণকর্তা' বলে অনুবাদ করে থাকি। খ্রিষ্ট খ্রিস্মা অর্থাৎ তৈলাভিষেক থেকেই অভিহিত। কেননা আমরা মোশির পুস্তকগুলোতে পড়ি যে, যখন নাভের সন্তান হোশেয়া জনগণকে পরিচালনা করার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, তখন তাঁর নাম 'হোশেয়া' থেকে 'যিশু'-তে পরিবর্তন করা হয়েছিল [ক] যাতে প্রকাশ পায় যে, যে জনগণ তাঁর অনুসরণ করছিল, তিনি তাদের ত্রাণ করবেন। অতএব, দু'জনেই 'যিশু' বলে অভিহিত ছিলেন: মিশর দেশ থেকে বের করা ও মরুপ্রান্তরে বিচরণ থেকে মুক্ত করা জনগণকে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করিয়েছিলেন যিনি, সেই তিনি, এবং এই যিশু যিনি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করা ও জগতের ভুলভ্রান্তি থেকে প্রত্যাহার করা জনগণকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এবং খ্রিষ্ট এমন নাম যা মহাযাজকদের বা রাজাদের নাম-বিশেষ; কেননা মহাযাজক ও রাজা যাঁরা, পূর্বকালে তাঁদের উভয়েরই খ্রিস্মা মলমে অভিষিক্ত করা হত [খ]। কিন্তু এঁরা মরণশীল ও ক্ষয়শীল হওয়ায় তাঁদের মর্ত ও ক্ষয়শীল মলমে অভিষেক করা হত। অন্যদিকে, পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হওয়ায়ই যিশুকে খ্রিষ্ট করে তোলা হয়, যেভাবে তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বর সেই যিশুকে স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন* [গ]। এবং ইশাইয়া একই কথা তখনই পূর্বঘোষণা করেছিলেন যখন পুত্রের হয়ে তিনি বলেছিলেন,

প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে [ঘ]।

তাই, 'যিশু' নামের অর্থ কি (তথা আপন জনগণকে ত্রাণ করেন যিনি তিনি) ও 'খ্রিষ্ট' নামের অর্থ কি (তথা যাঁকে চিরকালের মত মহাযাজক করা হয়েছে তিনি)[ঙ] তেমনটা দেখানোর পর, এসো, পরবর্তী কথায় দেখি কার বিষয়েই বা এ নাম দু'টো উচ্চারণ করা হয়। বিশ্বাস-সূত্র বলে চলে, 'তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু'। এখানে বিশ্বাস-সূত্রের শিক্ষা হলো এ যে, যাঁর কথা আমরা বলে এসেছি, সেই যিশু, এবং যাঁর নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে এসেছি, সেই খ্রিষ্ট হলেন 'ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র' ও 'আমাদের প্রভু'। পাছে তুমি দৈবাৎ মনে কর যে, এ মানবীয় নাম দু'টো পার্থিব অর্থ বহন করে, সেজন্য একথাটা যোগ করা হলো যে, তিনি 'ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, আমাদের প্রভু'। কেননা তিনি সেই একমাত্রজন যিনি সেই একমাত্রজন থেকে জন্ম নিলেন, সেইভাবে যেভাবে আলোর একটামাত্র দীপ্তি রয়েছে ও জ্ঞানের একটামাত্র বাণী রয়েছে। বিদেহী প্রজনন এমন বহুসংখ্যায়ও পরিণত হয় না, এমন বিভেদেও পতিত হয় না, অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেন যিনি তিনি জন্মদাতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন [চ]। তিনি 'একমাত্র' [পুত্র], সেইভাবে যেভাবে মনের সঙ্গে ধারণা, প্রজ্ঞাবানের সঙ্গে প্রজ্ঞা, বীরের সঙ্গে সাহস, উপলব্ধির সম্পর্কে কথা একমাত্র বন্ধনে সম্পর্কিত। কেননা প্রেরিতদূত দ্বারা যেমন পিতা *অনন্য প্রজ্ঞাবান* [ছ] বলে অভিহিত, তেমনি কেবল পুত্রই *প্রজ্ঞা* [জ] বলে অভিহিত। তাই তিনি হলেন সেই 'একমাত্র পুত্র'। আর যদিও গৌরব, অনন্তত্ব, গুণ, রাজত্ব ও পরাক্রম ক্ষেত্রে পিতা যা পুত্র ঠিক তা-ই, তবু পুত্র যে পিতার মত অনাদিকলীন ভাবেই এসমস্ত কিছুর অধিকারী তা নয়, বরং তিনি এসমস্ত পিতা থেকেই প্রাপ্ত, এমন পুত্র রূপেই সেইসব প্রাপ্ত, যিনি অনাদি ও সমকক্ষ; এবং যদিও তিনি সবকিছুর মাথা, তবু পিতাই তাঁরই মাথা। কেননা লেখা রয়েছে, *খ্রিষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর* [ঝ]।

৭। যখন তুমি **'পুত্র'** শব্দটা শোন, তখন মাংসানুযায়ী জন্মের কথা ভাববে না [ক], বরং একক ও যৌগহীন এমন বিদেহী পদার্থ সম্পর্কে যা বলা হয়, তা স্মরণ করবে। কেননা, আমি যেমন উপরে বলেছিলাম, সেই অনুসারে, যখন উপলব্ধি কথাকে, মন ধারণাকে ও আলো উজ্জ্বলতাকে নিজ থেকে জনিত করে, তখন যেভাবে পদার্থগত কোনও কিছুই

জনিত হয় না ও তেমন প্রজননে আমরা দুর্বল কিছুই ধারণা করি না, সেই অনুসারে প্রশ্ন রাখি, এসমস্ত কিছুর স্রষ্টা যিনি, তাঁর বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও বেশি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার কথা নয়?

তথাপি তুমি হয় তো বলবে, 'আপনি যে ধরনের প্রজননের কথা বলছেন, তা সত্তাগত নয়। কেননা আলো সত্তাবিশিষ্ট উজ্জ্বলতা উৎপাদন করে না, উপলব্ধিও সত্তাবিশিষ্ট কথাকে জনিত করে না, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে এমনটা দাবি করা হচ্ছে যে, তিনি সত্তাগত ভাবেই জনিত হয়েছিলেন।' এক্ষেত্রে আমি সর্বপ্রথমে বলব, যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয়, তখন তুলনাটা যে সবদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত হবে তা তো হয় না, কিন্তু দৃষ্টান্তটা যে একটামাত্র দিক লক্ষ করে, কেবল সেই দিকেই তুলনাটা যুক্তিসঙ্গত হয়। উদাহরণ যোগে, যখন সুসমাচারে বলা হয়, *স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা খাবারের মধ্যে লুকিয়ে রাখল* (খ), তখন আমরা স্বর্গরাজ্যকে কি সবদিক দিয়ে খামিরের মত বলে ভাবব, যার ফলে খামিরের মত স্বর্গরাজ্যও এমন স্পর্শগ্রাহ্য ও ক্ষয়শীল বস্তু যা টক ও অব্যবহার্য হয়ে যাবে? কিন্তু এ স্পষ্ট যে, দৃষ্টান্তটা কেবল এজন্যই তুলে ধরে নেওয়া হয়েছিল যাতে দেখানো যেতে পারে যে, ঈশ্বরের বাণী প্রচারকর্ম যতই ক্ষুদ্র একটা জিনিস প্রতীয়মান হোক না কেন, তবু বিশ্বাসের খামির দ্বারা মানুষের মন একতাবদ্ধ হতে পারে। একই প্রকারে, যখন সুসমাচার বলে, *স্বর্গরাজ্য তেমন এক টানা জালের মত, যা সমুদ্রে ফেলা হলে সব ধরনের মাছ সংগ্রহ করে* (গ), তখন আমাদের কি এমনটা ভাবতে হবে যে, স্বর্গরাজ্যের সত্তা সবদিক দিয়েই সেই সুতার মত যা দিয়ে জাল তৈরী, ও সেই নানা গিঁটের মত যা দ্বারা জালের বুনানি বেঁধে রাখা হয়? না। দৃষ্টান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই দেখানো যে, জাল যেমন সমুদ্র-গভীর থেকে মাছ কিনারায় নিয়ে আসে, তেমনি স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মাকে এজগতের অতলান্ত ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা হয়। এসমস্ত কিছু থেকে এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, দৃষ্টান্তগুলো যে দৃশ্যকে তুলে ধরে, সবদিক দিয়েই যে সেটার সদৃশ তা নয়। নইলে, দৃষ্টান্তগুলো ও তুলে ধরা দৃশ্যগুলো যদি সবদিক দিয়ে সমান হত, তাহলে দৃষ্টান্তগুলোকে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বলে আর বলা হত না, বরং দৃষ্টান্তগুলো যা সম্পর্কে ব্যবহৃত, দৃষ্টান্তগুলো ঠিক তা-ই হত।

৮। দ্বিতীয়ত, একথাও লক্ষণীয় যে, স্রষ্টা যেমন, তাঁর কোনও সৃষ্টবস্তু ঠিক সেইমত হতে পারে না। ফলে, ঐশসত্তা যেমন তুলনা বিহীন, ঈশ্বরত্বও তেমনি তুলনা বিহীন। উপরন্তু আমি একথাও বলতাম যে, প্রতিটি বস্তু শূন্য অবস্থা থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং, যে স্ফুলিঙ্গ অশরীরী হয়েও তবু নিজেই আগুন, সেটা যখন নিজ থেকে শূন্যতা হতে উদ্ভূত একটা সৃষ্টবস্তু জনিত করে ও সেই বস্তুতে তার নিজের আদি অবস্থা রক্ষা করে, তখন যে সনাতন আলো নিজেতে সত্তাহীন কিছুই ধারণ করে না বিধায় সবসময় বিদ্যমান ছিল, সেই সনাতন আলোর সত্তা কেনই বা নিজ থেকে সত্তাবিশিষ্ট উজ্জ্বলতা উৎপাদন করতে পারবে না? অতএব, পুত্রকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই **'একমাত্র'**(ক) বলা হয়, কারণ, যেহেতু তিনি সেইভাবে জন্ম নিয়েছিলেন, সেহেতু তিনি 'একমাত্র' ও 'অনন্য'। যা কিছু অনন্য তা কোনও তুলনা গ্রাহ্য করে না। একই প্রকারে সবকিছু গড়লেন যিনি, তিনিও যা গড়লেন, সত্তায় সেটার সদৃশ হতে পারেন না। তাই এটিই সেই খ্রিষ্ট যিশু, ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র যিনি উপরন্তু আমাদের প্রভুও। 'একমাত্র' শব্দটা পুত্র হিসাবে ও প্রভু হিসাবে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বেলায় আরোপণীয়। কেননা যিশু খ্রিষ্ট সত্যকার পুত্র হিসাবে ও একমাত্র প্রভু হিসাবে উভয় ক্ষেত্রেই 'একমাত্র'। কেননা অন্যান্য যত পুত্র, তারা পুত্র বলে অভিহিত হয়েও তবু প্রকৃতিগত সম্পর্কের ফলে নয়, দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ গুণেই তারা পুত্র বলে অভিহিত (খ)। আর যদি অন্যান্য কেউই বা থাকে যারা প্রভু বলে অভিহিত, তবে তারা জন্মগত নয় এমন মঞ্জুর করা অধিকার গুণেই প্রভু বলে অভিহিত। কিন্তু কেবল খ্রিষ্টই একমাত্র পুত্র ও একমাত্র প্রভু, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট* (গ)।

কুমারী থেকে প্রভু যিশুর জন্ম

অতএব, পিতা থেকে পুত্রের অনির্বচনীয় রহস্য ব্যক্ত করার পর বিশ্বাস-সূত্র এখন সেই ব্যবস্থার দিকে ফেরে যা দ্বারা তিনি মানব পরিত্রাণের জন্য নিজেকে অবনমিত করলেন। সূত্রটা উপরে তাঁকে 'ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র' ও 'আমাদের প্রভু' বলে অভিহিত করেছিল, এখন তাঁর বিষয়ে একথা বলে:

৯। **'তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন'**। মানুষদের মাঝে এই জন্ম ঐতিহাসিক ব্যবস্থা লক্ষ করে; অন্যদিকে আগেরটা ছিল ঐশসত্তার সঙ্গেই সম্পর্কিত; এটা তাঁর প্রসন্নতা সংক্রান্ত, আগেরটা তাঁর স্বরূপ সংক্রান্ত। তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী থেকে জন্ম নেন: এবচনের জন্য শুচিতম কান ও শুদ্ধতম মন চাই। কেননা এখানে তোমার যা উপলব্ধি করা দরকার তা হল এ, যাঁর বিষয়ে তুমি ইতিমধ্যে শিখেছিলে, তিনি পিতা থেকে অনির্বচনীয় ভাবে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর জন্য এখন একটি কুমারীর গর্ভের নিভৃত স্থানে পবিত্র আত্মা দ্বারা একটা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। এবং যেমন পবিত্র আত্মার পবিত্রীকরণে অপূর্ণতার কোনও চিন্তা ধারণ করা চলে না, তেমনি কুমারীর জন্মদানেও দূষণের কোনও ভাবনা কল্পনা করা চলবে না। কেননা এই জন্মদান এমন অভিনব জন্মদান যা জগৎকে দান করা হয়েছে, আর এইজন্যই এ জন্মদান ন্যায়সঙ্গতভাবে অভিনব, কেননা স্বর্গে একমাত্র পুত্র যিনি, এর ফলে তিনি মর্তেও হন একমাত্র পুত্র ও অনন্যভাবেই জন্ম নেন।

খ্রিষ্ট সম্পর্কে নবীদের সেই বাণীসকল যা অনুসারে *কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন* (ক) সকলের কাছে জানা ও সুসমাচারে বারে বারে প্রতিধ্বনিত। সেই জন্মদান যে কেমন অপরূপ ভাবে ঘটবে, এবিষয়ে নবী এজেকিয়েলও আগে থেকে ঘোষণা করে মারীয়াকে প্রতীকমূলক ভাবে 'প্রভুর দ্বার' বলে অভিহিত করেছিলেন, অর্থাৎ এমন দ্বার যা দিয়ে প্রভু জগতে প্রবেশ করেছিলেন; কেননা তিনি বলেন, *পূবমুখী দ্বার বন্ধ করা হবে, তা খোলা যাবে না, ও সেটা দিয়ে কেউই পার হবে না, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুই সেটা দিয়ে পার হবেন ও দ্বারটা বন্ধ করা হবে* (খ)। কুমারীর অক্ষুণ্ণতা সম্পর্কে এর চেয়ে স্পষ্ট কথা কীবা বলা যেতে পারত? কুমারীত্বের দ্বার বন্ধ করা হয়েছিল; সেই দ্বার দিয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু প্রবেশ করলেন; সেই দ্বার দিয়ে তিনি কুমারীর গর্ভ থেকে জগতে এগিয়ে এলেন, এবং কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষিত হয়েছিল বলে কুমারীর দ্বার চিরকাল ধরে বন্ধ অবস্থায় থাকল (গ)। এজন্য পবিত্র আত্মা প্রভুর মাংসের ও তাঁর মন্দিরের স্রষ্টা বলে চিহ্নিত।

১০। এখন তোমার পক্ষে পবিত্র আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে শুরু করা উচিত। কেননা তাঁর বিষয়ে সুসমাচার সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, যখন দূত কুমারীকে বলেছিলেন,

তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে ও তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনি নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন [ক], তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, *এ কেমন হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?* এবং এতে দূত বলেছিলেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য তোমা থেকে যে পবিত্রজন জন্ম নেবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন* [খ]। তাই লক্ষ কর কেমন করে ত্রিত্ব একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। বলা হচ্ছে, পবিত্র আত্মা কুমারীর উপরে আসবেন ও পরাৎপরের পরাক্রম তাঁর উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে। কিন্তু, ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যিনি, সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট ছাড়া পরাৎপরের সেই পরাক্রম আর কীবা হতে পারে? এই পরাক্রম কার? শাস্ত্রে বলে, তা পরাৎপরেরই। তাই এখানে সেই পরাৎপরও উপস্থিত, পরাৎপরের পরাক্রমও উপস্থিত, পবিত্র আত্মাও উপস্থিত, আর এটি হলেন সেই ত্রিত্ব যিনি সর্বস্থানে গুপ্ত, সর্বস্থানে প্রতীয়মান, নামে ও ব্যক্তি হিসাবে স্বকীয় তবু ঈশ্বরত্বের সত্তায় অবিচ্ছেদ্য। আর যদিও কেবল পুত্রই কুমারী থেকে জন্ম নেন, তবু পরাৎপরও উপস্থিত, পবিত্র আত্মাও উপস্থিত, যাতে করে কুমারীর গর্ভধারণ ও জন্মদান পবিত্রীত হয়।

১১। শাস্ত্রের নবীদের দ্বারা ঘোষিত বলে এসব কিছু হয় তো ইহুদীদের নিশ্চুপ করতে পারে যদিও তারা অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসবিহীন। কিন্তু বিজাতীয়েরা যখন আমাদের একটি কুমারীর জন্মদানের কথা প্রচার করতে শোনে, তখন তারা আমাদের বিষয়ে প্রায়ই হাসে। সেজন্য স্বল্প কথায় তাদের সমস্ত আপত্তিতে প্রতিবাদ করা দরকার। আমি ধরে নিচ্ছি, প্রতিটি জন্মদান তিনটে শর্তের উপর নির্ভর করে: উপযুক্ত বয়সের একটি স্ত্রীলোক থাকবে, সেই স্ত্রীলোক একটি পুরুষের সঙ্গে মিলিতা হবে, তার গর্ভ বন্ধ্যাত্ব দ্বারা বন্ধ হবে না। আমরা যে জন্মদানের কথা বলছি, সেই জন্মদানে সেই তিনটে শর্তের মধ্যে একটা শর্ত তথা সেই পুরুষ নেই। এতে আমরা বলি, যেহেতু যাঁর জন্মাবার কথা তিনি পার্থিব নয় স্বর্গীয়ই মানুষ ছিলেন, সেজন্য, মাতার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন হয়ে থেকে পুরুষের ভূমিকা আত্মা দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল।

অথচ একটি কুমারী যে গর্ভধারণ করে, তাতে আশ্চর্যের কীবা আছে, যখন লোকে যে প্রাচ্য পাখিকে ফৈনিক্স (ক) বলে ডাকে, সেই পাখি মদ্দা ছাড়া জন্মও নিয়ে বা পুনরায় জন্মও নিয়ে অবিরতই একক হয়ে থাকে এবং অবিরতই জন্ম ও নবজন্মের দ্বারা নিজেকে পুনর্গঠিত করে। মৌমাছির কথা ধরলে, তবে এ জানা কথা যে, তারা সঙ্গমও জানে না, বাচ্চাগুলোকেও যন্ত্রণা ছাড়া প্রসব করে থাকে (খ)। অন্যান্য সৃষ্টজীবও রয়েছে যেগুলো, দেখা যাচ্ছে, তেমন প্রসবনিয়মের অধীন। তাই গোটা জগতের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঐশপরাক্রম যে এমন কিছু সম্পাদন করবে যা জীবজন্তুর প্রসবকালেও দেখা যেতে পারে, আমরা তেমন কিছু কি অবিশ্বাস্য মনে করব? এমনকি, যারা বিশ্বাস করে তাদের নিজেদের সেই মিনের্ভা যুপিতেরের মস্তিষ্ক থেকে জন্ম নিল (গ), সেই বিজাতীয়রা যে কুমারীর প্রসব অসম্ভব বোধ করছে তা আমাকে বিস্মিতই করে। কোনটা বিশ্বাস করতে বেশি কঠিন? কোনটা বেশি প্রকৃতি বিরুদ্ধ? এখানে স্ত্রীলোক আছে, এখানে প্রকৃতির নিয়ম সংরক্ষিত, এখানে গর্ভধারণ স্বীকৃত, এখানে সঠিক কালের পর প্রসব ঘটে। সেখানে কোনও স্ত্রীলোক জড়িত নেই, কেবল একটা পুরুষ ও একটা প্রসব রয়েছে। যে কেউ তেমনটা বিশ্বাস করে, সে কেন আমাদেরটায় বিস্মিত হবে? আরও, তারা নাকি বলে, বাক্কুস পিতা (ঘ) যুপিতেরের উরু থেকে জন্ম নিয়েছিল; এটাও অলৌকিক অন্য ব্যাপার, অথচ তারা তাতে বিশ্বাসী। যাকে তারা আফ্রদিতেস (ঙ) বলে ডাকে সেই ভেনুস দেবীর সম্পর্কেও তারা বলে, সে সমুদ্রের ফেনা থেকে জন্ম নিয়েছিল, যেইভাবে তার নিজের নাম ইঙ্গিত করে। তারা সমর্থন করে, কাস্তর ও পল্লুক্স (চ) একটা ডিম থেকে, ও মির্মিদোনেরা (ছ) পিঁপড়া থেকে জন্মেছিল। আরও হাজার হাজার জিনিস রয়েছে যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়েও তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, যেমন দেউকালিওন ও পির্‌হার (জ) ছোঁড়া সেই পাথরগুলো যা থেকে ফসলই যেন মানুষ বের হল। অথচ, তারা এসমস্ত কাল্পনিক কাহিনী, এমনকি আরও আরও কাহিনী বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তারা এই একটা মাত্রই, তথা, উপযুক্ত বয়সের একটি স্ত্রীলোক যে মানুষের দূষণ ছাড়া কিন্তু ঈশ্বরের আত্মিক প্রেরণাগুণেই একটি ঐশসন্তানকে গর্ভধারণ করবেন, তারা ঠিক এই একটা মাত্র বিষয়ই অসম্ভব মনে করে। যখন তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা এত কঠিন ব্যাপার, তখন তাদের এটিই উচিত ছিল যে, তারা তত জঘন্য গল্পে কখনও বিশ্বাস রাখবে না।

অন্যদিকে, তাদের কাছে বিশ্বাস করা সহজ ব্যাপার হলে তবে তাদের উচিত হত, তাদের তত অযোগ্য ও তত নিকৃষ্ট রূপকথার চেয়ে আমাদের তত মর্যাদাপূর্ণ ও তত পবিত্র বিষয়ই অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে বিশ্বাস করা।

১২। তথাপি তারা হয় তো বা বলে, একটি কুমারী যে গর্ভবতী হবে তা যখন ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব, তখন সেই কুমারী যে প্রসব করবে তাও সম্ভব, কিন্তু, তেমন মহিমা যে একটা নারীর গর্ভে প্রবেশ করবে তা তারা অযোগ্য মনে করে। পুরুষের সঙ্গে মিলনের ফলে দূষণ না থাকলেও তবু তারা বলে চলে, প্রসব ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটেছিল অশ্লীল সেই হস্তচালন যা লজ্জাকর বিষয়। আচ্ছা, তাদের অভিযোগে তাদের নিজেদের যুক্তি অনুসারে উত্তর দেবার জন্য, এসো, একটু সময় নিই। এমন কেউ যদি দেখত, একটা ছেলে গভীর কাদাজলে স্বাসরুদ্ধ হচ্ছে, এবং নিজে পূর্ণবয়সী ও শক্তিশালী হওয়ায় যদি মরণাপন্ন ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য সেই কাদাজলে, বলতে গেলে, সেই কাদাজলের শেষ প্রান্তেই, ঢুকত, তবে, সেই মানুষ কাদাজলে নেমেছে বিধায় তুমি কি তাকে দূষিত বলে নিন্দা করতে, নাকি, মরণাপন্নের প্রাণ বাঁচিয়েছে বিধায় তাকে দয়াবান বলে তার প্রশংসা করতে? কিন্তু এসব কিছু সাধারণ একটা মানুষকে লক্ষ করে। এসো, জন্ম নিলেন যিনি তাঁরই প্রকৃতির কথায় ফিরে আসি। তোমার বিবেচনায়, তাঁর তুলনায় সূর্যের প্রকৃতি কতখানি নিম্ন? কোনও সন্দেহ নেই, তা ততখানি নিম্ন যতখানি সৃষ্টবস্তু স্রষ্টার তুলনায় নিম্ন। এবার ধর: যদি সূর্যের একটা রশ্মি কাদাজলের উপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই রশ্মি কি সেই কাদা থেকে কোনও প্রকার দূষণে আক্রান্ত হয়? নাকি, জঘন্য জিনিসের উপরে আলো ছড়ায় বিধায় সূর্য কি নিন্দনীয়? আগুনের কথাও ধর: আমরা যা সম্পর্কে কথা বলছি, সেই সমস্ত বস্তুর তুলনায় আগুনের প্রকৃতি কতটুকু নিম্নতর? অথচ যত জঘন্য ও নিছক হোক সেই বস্তু যা আগুনে দেওয়া হয়, কেউই এমনটা বিশ্বাস করে না যে সেই বস্তু আগুনকে দূষিত করবে। যখন জড় পদার্থের বেলায় ব্যাপারটা এরূপ, তখন তুমি কি মনে কর, উৎকৃষ্ট ও নিরাকার যে প্রকৃতি সমস্ত আগুন ও সমস্ত আলোর ঊর্ধ্বে, সেই প্রকৃতির বেলায় কোনও দূষণ বা কোনও কলঙ্ক কিছুটা করতে পারে? কিন্তু আর একটা জিনিস রয়েছ যা বিবেচনার বিষয়। আমরা নাকি বলে থাকি, ঈশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যদি এমনটা মনে হয় যে, নিজের কর্মকে পুনরুদ্ধার

করতে গিয়ে ঈশ্বর দূষিত হন, তাহলে গুরুতর কারণে এমনটা মনে করতে হবে যে, তিনি প্রথম বারের মত সেই কর্ম সম্পাদনেই দূষিত হয়েছিলেন। আর যখন তুমি বলতে পার না কেনই বা তিনি জঘন্য কর্ম সম্পাদন করেছেন, তখন কেনই বা তিনি তেমন জঘন্যতার মধ্য দিয়ে গেলেন এমন প্রশ্ন তোলা সময় নষ্ট! অতএব, প্রকৃতি নয়, বরং প্রচলিত ধারণাই এসমস্ত কিছুতে অশালীনতা দেখতে আমাদের শিখিয়েছে। কেননা দেহের সমস্ত অঙ্গ সেই একই ও একমাত্র ধুলো দিয়ে গড়া, এবং একমাত্র পার্থক্য এ যে, এক একটা নিজ নিজ ব্যবহার ও প্রকৃতিগত ভূমিকা অনুসারেই পৃথক।

১৩। কিন্তু তবু এ সমস্যা সমাধান ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় রয়েছে যা উপেক্ষা করার নয়। তা হলো এ যে, ঈশ্বরের সত্তা সম্পূর্ণরূপে নিরাকার হওয়ায় তা প্রথমত দেহগুলোতে প্রবেশ করানো বা সেই দেহগুলোর পক্ষে তা গ্রহণ করে নেওয়া যেতে পারে না যদি না মধ্যস্থ হিসাবে এমন কোনও আধ্যাত্মিক সত্তা থাকে যা ঐশআত্মাকে গ্রহণ করে নিতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আমরা বলি, আলো দেহের সমস্ত অঙ্গকে আলোকিত করতে পারে, তবু সেই আলো চোখ দ্বারা ছাড়া অন্য কোনও অঙ্গ দ্বারা গৃহীত হতে পারে না। কেননা চোখই মাত্র আলো গ্রহণ করতে সক্ষম। একই প্রকারে, ঈশ্বরের পুত্র একটি কুমারী থেকে জন্ম নেন: তিনি যে প্রথমত কেবল তাঁর মাংসের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত এমন নয়, তিনি বরং একটা আত্মা নিয়েই জনিত হয়েছিলেন যা মাংস ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ। তাই মধ্যস্থ হিসাবে সেই আত্মাকে নিয়ে ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণের গুপ্ত নগরীতে ঈশ্বরের বাণীকে গ্রহণকারী সেই আত্মাকে নিয়ে ঈশ্বর কুমারী থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, আর সেই জন্মগ্রহণে অপমানজনক এমন কিছুই ছিল না যেইভাবে তুমি ভাবছিলে। তাই, যেখানে [পবিত্র] আত্মার পবিত্রীকরণ উপস্থিত, এবং যে মানবাত্মা ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে সক্ষম, যেখানে সেই আত্মা মাংসও ধারণ করল, সেখানে কিছুই জঘন্য ও অপমানজনক বলে পরিগণিত হতে পারে না। যেখানে পরাৎপরের পরাক্রম উপস্থিত ছিল, সেখানে তুমি কিছুই অসাধ্য বলে গণ্য করো না। যেখানে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা ছিল, সেখানে মানব দুর্বলতার কোনও কথাই ভেবো না।

ক্রুশারোপণের অর্থ

১৪। **‘পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ও সমাহিত হয়ে তিনি পাতালে অবরোহণ করলেন’**[ক]। প্রেরিতদূত পল আমাদের শেখান যে, আমাদের *অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করা’* উচিত *‘যেন সেই উচ্চতা, বিস্তার, ও গভীরতা উপলব্ধি* [খ] করতে পারি। সেই ‘উচ্চতা, বিস্তার ও গভীরতা’ হলো ক্রুশেরই বর্ণনা। ক্রুশের যে অংশ মাটিতে রোপিত তা তিনি ‘গভীরতা’ বলেন; ‘উচ্চতা’ বলে তিনি সেই অংশ বোঝান যা ভূমি থেকে প্রসারিত হয়ে ঊর্ধ্বের দিকে উচ্চ হয় ; এবং ‘বিস্তার’ বলে তিনি সেই অংশ বোঝান যা ডান ও বাঁ দিকে বিস্তৃত। সুতরাং, যেহেতু মৃত্যু ক্ষেত্রে এমন বহু উপায় রয়েছে যা দিয়ে মানুষ এজীবন ত্যাগ করতে পারে, সেজন্য কেনই বা প্রেরিতদূত ইচ্ছা করেন আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত হোক ও আমরা সেই কারণ জানব যার জন্য ত্রাণকর্তার মৃত্যু ক্ষেত্রে সমস্ত উপায়ের মধ্যে ক্রুশই বাছাইকৃত উপায় হলো? অবশ্যই, আমাদের এ বোঝা উচিত যে, সেই ক্রুশ ছিল জয়যাত্রা স্বরূপ, উৎকৃষ্টই একটা জয়চিহ্ন। তথাপি জয়যাত্রাটা শত্রুর পরাজয়েরই চিহ্ন। তাই আপন আগমনে খ্রিষ্ট, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, তিনটে রাজ্য একসাথে বশীভূত করেছিলেন (কেননা প্রেরিতদূত ঠিক তা-ই বোঝান যখন বলেন, *যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়* [গ]) ও এ রাজ্য তিনটে তিনি নিজের মৃত্যু দ্বারাই জয় করেছিলেন। এজন্যই এমন মৃত্যু কল্পিত হয়েছিল যা হয়ে উঠবে এ রহস্যের প্রতীক স্বরূপ, যাতে করে বায়ুলোকে উত্তোলিত হয়ে ও অ বায়ুলোকের যত প্রতাপ বশীভূত করে তিনি ঊর্ধ্বলোকের ও স্বর্গীয় এই প্রতাপগুলোর উপর আপন বিজয় দেখাতে পারেন। তাছাড়া, পবিত্র নবীর কথামত, তিনি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়া জনগণের প্রতি *সারাদিন ধরে নিজের হাত দু’টো বাড়িয়েছিলেন* [ঘ] যাতে করে একই সময় তিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করতে ও বিশ্বাসীদের আহ্বান করতে পারেন; এবং ক্রুশের যে অংশ মাটিতে পোঁতা, তা দ্বারা দেখালেন, তিনি পাতালরাজ্য নিজের অধীনে বশীভূত করেছেন।

১৫। আমি অদীক্ষিতদের কাছে গুপ্ত রাখা কয়েক বিষয় সম্পর্কে স্বল্প কথা বলতে যাচ্ছি। সেই আদি থেকে যখন ঈশ্বর জগৎ গড়েছিলেন, তখন তার উপরে তিনি স্বর্গীয় কয়েকটা

প্রতাপ নিযুক্ত ও নির্দিষ্ট করেছিলেন যেগুলো মানবজাতিকে শাসন করবে ও তার উপরে অধিকার রাখবে। বিষয়টা মোশি নিজে দ্বিতীয় বিবরণের গীতিকায় ইঙ্গিত করে বলেন, *সেই পরাৎপর যখন দেশগুলোকে পৃথক পৃথক করেছিলেন, তখন ঈশ্বরের দূতদের সংখ্যা অনুসারে তিনি স্থির করেছিলেন দেশগুলোর সীমারেখা* (ক)। কিন্তু এ দূতগুলোর মধ্যে কয়েকজন, এবং সেই একজন যাকে 'জগতের অধিপতি'(খ) বলা হয়, যে অধিকার ঈশ্বর তাদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন তারা সেই অধিকার গ্রহণের সময়ে যে যে নিয়মবিধি পেয়েছিল, সেই নিয়মবিধি বজায় রেখে সেই অধিকার অনুশীলন করল না, এবং মানবজাতিকেও ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে না শিখিয়ে তারা বরং তাদের নিজেদের চতুর প্ররোচনা পালন করতেই শেখাল। ফলে পাপের ঋণপত্র আমাদের বিরুদ্ধে লেখা হল, যেইভাবে নবী বলেন, *আমাদের পাপকর্মের কারণেই আমাদের বিক্রি করা হয়েছে* (গ)। কেননা প্রতিটি মানুষ যখন লালসায় লিপ্ত হয়, তখন নিজের প্রাণের মূল্য গ্রহণ করে। তাই সেই ঋণপত্রের অধীন হয়ে প্রতিটি মানুষকে সেই ধূর্ত শাসকদের দ্বারা রাখা হচ্ছিল, কিন্তু আপন আগমনে খ্রিষ্ট সেই ঋণপত্র ছিঁড়ে ফেললেন ও সেই শাসকদের অধিকারবঞ্চিত করলেন। মহা রহস্যের আড়ালে পল ঠিক একথা তখনই ইঙ্গিত করেন যখন তাঁর বিষয়ে বলেন, *যে লিখিত ঋণপত্র আমাদের প্রতিকূল ছিল, তিনি তা বাতিল করে ও তা ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে বন্দি অবস্থায় নিয়ে গিয়ে নিজের জয়যাত্রায় টেনে নিয়েছিলেন* (ঘ)। তাই ঈশ্বর যে শাসকদের মানবজাতির উপরে নির্দিষ্ট করেছিলেন, তারা অদম্য ও অত্যাচারী হয়ে নিজেদের হাতে ন্যস্ত করা মানুষদের আক্রমণ করল ও পাপের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ দ্বারাই তাদের ছত্রভঙ্গ করল, যেইভাবে নবী এজেকিয়েল তখনই রহস্যময় ভাবে ইঙ্গিত করেন যখন বলেন, 'সেই দিন ইথিওপিয়াকে বিনাশ করার জন্য স্বর্গদূতেরা নির্গত হবেন, ও মিশরের সেই দিনটিতে তাদের মধ্যে আলোড়ন বিরাজ করবে, কেননা দেখ, তিনি আসছেন (ঙ)। সুতরাং, খ্রিষ্ট সম্পর্কে বলা হয়, তাদের সর্বশক্তিশালী প্রতাপ থেকে তাদের বঞ্চিত করে তিনি জয়যাত্রা করলেন ও তাদের কাছ থেকে যে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তিনি সেই অধিকার মানুষদের দিলেন, যেইভাবে সুসমাচারে তিনি নিজে শিষ্যদের বলেন,

‘দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছে, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রম পায়ের নিচে মাড়াবার অধিকার দিয়েছি [চ]।

তাতে যারা গৃহীত অধিকার অপব্যবহার করেছিল, খ্রিষ্টের ক্রুশ তাদের তাদেরই অধীনে বশীভূত করল যারা তাদের অধীনে বশীভূত ছিল। কিন্তু সেই ক্রুশ সর্বপ্রথমে আমাদের অর্থাৎ মানবজাতিকে মৃত্যু পর্যন্ত পাপ প্রতিরোধ করতে ও প্রভুভক্তির খাতিরে সেচ্ছায়ই মৃত্যুবরণ করতে শেখায়। দ্বিতীয়ত, সেই একই ক্রুশে তিনি আমাদের সামনে বাধ্যতার এমন আদর্শ তুলে ধরেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে তিনি আমাদের আগেকার শাসকদের উপরে অবাধ্যতার দণ্ড আরোপ করেছিলেন। সুতরাং, শোন কেমন করে প্রেরিতদূত আমাদের কাছে খ্রিষ্টের ক্রুশ দ্বারা বাধ্যতা শেখাতে ইচ্ছা করেন: *খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন* [ছ]। তাই, নিজে এমন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হওয়ায় যিনি যা শেখাতেন তা-ই করতেন, তিনি বাধ্যতা দেখানোতে নিজেই আগে মৃত্যুবরণ করায় সেই বাধ্যতা শেখালেন যা সৎমানুষের পক্ষে মৃত্যুমূল্যেও দেখানো দরকার।

১৬। কিন্তু এমনটা হতে পারে যে, কেউ না কেউ এধরনের শিক্ষায় আতঙ্কিত হচ্ছে, কারণ একটু আগে আমি তাঁর বিষয়ে বলেছিলাম, তিনি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত ও ঈশ্বরের নিজের সত্তা থেকে জনিত, এবং একথা শিখিয়েছিলাম যে, রাজত্ব, মহিমা ও অনন্তত্ব ক্ষেত্রে তিনি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে এক; অথচ এখন তাঁর মৃত্যুর কথাই আমার বক্তব্য। তথাপি, হে বিশ্বস্ত শ্রোতা, আতঙ্কিত হয়ো না। একটু পরে, যাঁর মৃত্যুর কথা শুনছ তাঁকে তুমি পুনরায় অমর দেখতে পাবে, কেননা যে মৃত্যু তিনি বরণ করতে যাচ্ছেন সেই মৃত্যু মৃত্যুকে বিবস্ত্র করবে। কেননা যে ধারণ-করা-মাংস রহস্য আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি, সেই রহস্যের কারণ হলো এ: ঈশ্বরের পুত্রের ঐশপ্রতাপ মানবমাংসের আকারেই আবৃত একটা বড়শির মত (বস্তুত প্রেরিতদূত পলের কথা অনুসারে তিনি ‘*আকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন*’[ক] হয়েছিলেন) জগতের অধিপতিকে সংগ্রামে আহ্বান

করবে, এবং খ্রিষ্ট নিজের মাংস টোপ হিসাবে উপস্থাপন করতে করতে তাঁর ঈশ্বরত্ব তলে তলে তাকে ধরে তাঁর নির্মল রক্ত ক্ষরণ দ্বারা তাকে বড়শিতে (খ) আটকিয়ে রাখবে। কেননা কোনও পাপের কালিমা জানেন না যিনি কেবল তিনিই সকলের পাপ মুছিয়ে দিয়েছেন, বা কমপক্ষে তাদেরই পাপ মুছিয়ে দিয়েছেন যারা নিজেদের বিশ্বাসের দরজার বাজু দু'টোকে তাঁর রক্তে চিহ্নিত করেছে (গ)। তাই, যেমন একটা মাছ টোপে গুপ্ত বড়শিটা ধরে বড়শি থেকে টোপটা বের করতে পারে না বরং অন্যান্য মাছের জন্য নিজেই টোপ হবার লক্ষ্যে তাকে জল থেকে তুলে নেওয়া হয়, ঠিক তেমনি মৃত্যুর উপর যে কর্তৃত্ব রাখছিল, সে এমনটা টের না পেয়ে যে, যিশুর দেহে ঈশ্বরত্বের বড়শি রয়েছে, যিশুর মৃত্যুতে সেই দেহ কেড়ে নিল, কিন্তু সেই দেহ গ্রাস করে সাথে সাথে সে নিজেই ধরা পড়ল, এবং পাতালের অর্গল উচ্ছিন্ন হতে হতেই, অন্যান্যদের জন্য টোপ হবার লক্ষ্যে তাকে অতল গহ্বর থেকে তুলে নেওয়া হল। এসমস্ত যে একদিন ঘটবার কথা, সেবিষয়ে অনেক আগে থেকেই নবী এজেকিয়েল একই বর্ণনা ব্যবহার করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, *আমি আমার বড়শি দিয়ে তোমাকে ধরে মাটির উপরে টানব। যত মাঠ তোমাতে ভরে যাবে, আর আমি তোমার উপরে আকাশের সকল পাখি নিযুক্ত করব ও তোমাকে নিয়ে পৃথিবীর সকল জন্তুর ক্ষুধা মিটিয়ে দেব* (ঘ)। এবিষয়ে নবী দাউদও বলেন, *তুমি মহানাদবের সাত মাথা চূর্ণ করলে, তাকে ইথিওপীয় জাতিদেরই খেতে দিলে* (ঙ)। একই প্রকারে যোবও একই রহস্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কেননা তিনি প্রভুকে উপস্থাপন করেন যিনি তাঁকে বলছেন, *তুমি কি বড়শিতে দানবকে ধরে টানতে পার? তার নাসিকা কি দড়িতে বাঁধতে পার?* (চ)।

১৭। অতএব, খ্রিষ্ট যে নিজের মাংসে যন্ত্রণাভোগ করলেন, তাতে তাঁর ঈশ্বরত্ব ক্ষতিগ্রস্ত বা আঘাতগ্রস্ত হয়নি, বরং মাংসের দুর্বলতার মাধ্যমে তিনি যেন পরিত্রাণ সাধন করতে পারেন সেজন্য ঐশস্বরূপ মাংসের মাধ্যমে মৃত্যুতে নেমে গেল। তাঁকে যেন মরণশীলতার নিয়ম অনুসারে মৃত্যু দ্বারা বেঁধে রাখা হয় এজন্য নয়, বরং তিনি পুনরুত্থান করায় যেন নিজ থেকে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করতে পারেন এজন্যই এসমস্ত ঘটেছিল। এমনটা হল কেমন যেন এক রাজা কারাবাসে গিয়ে তাতে প্রবেশ করে দরজাগুলো খুলে দিতেন, বাঁধন উন্মুক্ত করতেন, বেড়ি , অর্গল ও শেকল ভেঙে দিতেন, বন্দিদের মুক্ত করে বের

করতেন ও *অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে ছিল যারা* [ক] তাদের সকলকে আলো ও জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতেন। তেমন অবস্থা ক্রমে অবশ্যই বলা হয়, রাজা কারাগারে গেলেন, কিন্তু যারা কারাগারে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে তিনি সেই অবস্থায় যাননি। তারা দণ্ড ভোগ করতে, তিনি কিন্তু দণ্ড মোচনই করতে সেখানে ছিলেন।

যন্ত্রণাভোগের কথা পুরাতন নিয়মের ভাববাণীতে পূর্বঘোষিত

১৮। উপরন্তু, যাঁরা বিশ্বাস-সূত্রকে সম্প্রদান করে এসেছেন, তাঁরা অধিক যত্ন সহকারেই ঘটনাগুলোর সময়টা নির্দিষ্ট করেছেন, তথা **‘পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে’**[ক], যা কিছু ঘটেছিল সেই পরম্পরা যেন কোনও কিছুতেই অনির্দিষ্ট অনিশ্চয়তায় টলে না যায়। এবিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত যে, ‘তিনি পাতালে অবরোহণ করলেন’ বচনটা রোম মণ্ডলীর বিশ্বাস-সূত্রেও যুক্ত নয়, প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাস-সূত্রেও নেই [খ]। তথাপি এমনটা মনে হচ্ছে, বচনটার অর্থ তিনি **‘সমাহিত হলেন’** বচনটায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, ঐশশাস্ত্রের প্রতি যে ভক্তি ও আগ্রহ তোমাকে আবদ্ধ করে, সেটার খাতিরে তুমি নিঃসন্দেহেই আমাকে বলবে যে, এসমস্ত কিছু ঐশশাস্ত্রের স্পষ্টতর সাক্ষ্য দ্বারাই প্রমাণিত হওয়া উচিত। কেননা যা কিছু বিশ্বাসের বিষয়, সেই সমস্ত কিছু যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ততখানি উপযোগী ও সন্দেহমুক্ত সাক্ষ্যদান দাবি করে। কথাটা ঠিক। কিন্তু, যেহেতু আমি ধরে নিচ্ছি, আমি তাদেরই সঙ্গে কথা বলছি যারা বিধান জানে, সেজন্য সংক্ষিপ্ততার খাতিরেই আমি একটা সাক্ষ্য-অরণ্যই অব্যক্ত রেখেছি। তথাপি তেমনটাও দাবীকৃত হলে তবে এসো, বহুগুলো সাক্ষ্যের মধ্য থেকে অল্প কয়েকটা ব্যক্ত করি, একথা জেনে যে, বিজ্ঞ শাস্ত্রবিদ ঐশশাস্ত্রে প্রশস্তই এক সাগর-সাক্ষ্য খুঁজে পাবেন।

১৯। সর্বপ্রথমে এবিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত যে, ক্রুশ-তত্ত্বটা সকলের দ্বারা একই আলোতে বিবেচিত নয়। বিজাতীয়দের কাছে ক্রুশটা এক রকম, ইহুদীদের কাছে অন্য রকম, খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে অন্য রকম; যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর, কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের*

কাছে ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (ক) ; এবং একই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, *কেননা যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, তাদের কাছে অর্থাৎ এই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম* (খ)। খ্রিষ্ট যে চিরকাল বিরাজ করবেন, যারা নিজেদের বিধানের এই পরম্পরার উপর নির্ভর করত, সেই ইহুদীদের কাছে খ্রিষ্টের ক্রুশ ছিল পতনের কারণ, কারণ তারা তাঁর পুনরুত্থানের কথা মানতে অনিচ্ছক ছিল; এবং বিজাতীয়দের কাছে এমনটা মূর্খতাই মনে হচ্ছিল যে ঈশ্বর মৃত্যুবরণ করবেন, কারণ তারা সেই ধারণ-করা-মাংস রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু যারা তাঁর জন্ম, মাংসে তাঁর যন্ত্রণাভোগ, ও মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান মেনে নিয়েছিল, সেই খ্রিষ্টিয়ানেরা অবশ্যই খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের সেই পরাক্রম বলে বিশ্বাস করেছিল যা মৃত্যুর উপর জয়ী হয়েছিল।

সুতরাং, প্রথমত: যারা আগে থেকে নবীদের দ্বারা এবিষয়ে জ্ঞাত হয়েছিল, সেই ইহুদীরা যে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু যারা নবীদের দ্বারা কখনও কিছুই শোনেনি তারাই যে বিশ্বাস করবে, একথা ইশাইয়া দ্বারাই ভাববাণী ক্রমেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল যেইভাবে তুমি তাঁর এবাণী থেকে অনুমান করতে পার, *যাদের কাছে এবিষয়ে কখনও কিছুই বলা হয়নি, তারা দেখতে পাবে, ও যারা শোনেনি, তারা উপলব্ধি করবে* (গ)। আর ইশাইয়া এও বলেন যে, যারা ছেলেবেলা থেকে প্রাচীন বয়স পর্যন্ত বিধান অধ্যয়নে নিবিষ্ট ছিল, সেই জনগণ বিশ্বাস করল না, এবং সমস্ত রহস্যটা তাদের কাছ থেকে বিজাতীয়দেরই কাছে তুলে দেওয়া হবে; তিনি এভাবে ব্যাপারটা ব্যক্ত করেন, *সেনাবাহিনীর প্রভু এই পর্বতের উপর সকল বিজাতির জন্য সাজিয়ে রাখবেন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ: তারা আনন্দ-ফুর্তি পান করবে, আঙুররস পান করবে, এই পর্বতে তাদের সুরভী মলমে অভিষিক্ত করা হবে। এসমস্ত কিছু বিজাতীয়দের কাছে সম্প্রদান কর, কারণ সকল বিজাতীয়দের জন্য এটিই সর্বশক্তিমানের সুমন্ত্রণা* (ঘ)। কিন্তু এমনটা হতে পারে যে, যারা বিধান জ্ঞান সম্পর্কে বড়াই করে তারা আমাদের বলবে, 'প্রভুকে যে মৃত্যু-ক্ষয়ের ও ক্রুশ-যন্ত্রণার অধীন করা হয়েছে, তেমনটা বলায় তোমরা ঈশ্বরনিন্দা কর'। সুতরাং তোমরা তা-ই পড় যা তোমাদের উদ্দেশ করে যেরেমিয়ার বিলাপ-গাথায় লেখা রয়েছে, তথা, *আমাদের মুখমণ্ডলের আত্মা সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে আমাদের ক্ষয়শীলতায় ধরে নেওয়া*

হয়েছে; *তাঁর বিষয়ে আমরা বলতাম, তাঁর ছায়ায় আমরা বিজাতীয়দের মাঝে জীবনযাপন করব* (ঙ)। তুমি তো শুনতে পাচ্ছ কেমন করে নবী বলছেন, খ্রিষ্টকে ধরে নেওয়া হল ও আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের পাপের জন্য ক্ষয়শীলতায় সঁপে দেওয়া হল। যেহেতু ইহুদীরা জেদ করে অবিশ্বাসে থেকে গেল, সেজন্য, তাঁর কথা অনুসারে, বিজাতীয়দেরই 'তাঁর ছায়ায়' স্থান দেওয়া হল; আর প্রকৃতপক্ষে আমরা ইস্রায়েলে নয়, বিজাতীয়দেরই মাঝে জীবনযাপন করছি।

২০। বিষয়টা তোমার কাছে ক্লান্তিকর মনে না হলে (ক) তবে আমি খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখাব কেমন করে সুসমাচারের বর্ণনার কতিপয় ঘটনা নবীদের পুস্তকাদিতে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, যাতে করে, যারা বিশ্বাসের প্রথম বিষয়াদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে, এ সাক্ষ্যগুলো যেন তাদের হৃদয়ফলকে লেখা হয়, পাছে বিরোধী কোন অনিশ্চয়তা তাদের কাছ থেকে সেই সমস্ত কিছু কেড়ে নেয় যা তারা বিশ্বাস করে। সুসমাচারে আমাদের বলা হয় যে, খ্রিষ্টের বন্ধুদের ও সহভোজীদের একজন সেই যুদা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। বিষয়টা কেমন করে সামসঙ্গীতে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, তা শোন: *আমার রুটি যে ভাগ করে খেল, সে আমার বিরুদ্ধে বাড়াল পা* (খ), এবং অন্যত্র শাস্ত্রে বলে, *আমার বন্ধু ও প্রতিবেশী সকল আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াল* (গ); আরও, *তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ ওর কথা, কিন্তু ছিল তীরের মত* (ঘ)। তুমি কি শুনতে ইচ্ছা কর, সেই কথা কেমন স্নিগ্ধ ছিল? *যুদা যিশুর কাছে গেলেন; তাঁকে বললেন, মঙ্গল হোক, রাব্বি! এবং তাঁকে চুম্বন করলেন* (ঙ)। চুম্বনের স্নিগ্ধ তোষামোদের মধ্য দিয়ে যুদা ছুঁড়লেন বিশ্বাসঘাতকতার তীর। তাতে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, '*যুদা, চুম্বন দিয়েই কি মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছ?* (চ)। তুমি এবারও শুনতে পাচ্ছ, বিশ্বাসঘাতকের লোভের ফলে যিশুকে ত্রিশটা রুপোর টাকা ধার্য করা হয়েছিল; এবিষয়েও শোন নবীর বাণী, *আর আমি তাদের বললাম: তোমরা যদি ঠিক মনে কর, আমার মজুরি দাও, নইলে থাক্* এরপর তিনি বলে চলেন, '*আমি সেই ত্রিশটা রুপোর টাকা নিলাম ও তা প্রভুর গৃহে, ঢালাইকুণ্ডে, ফেলে দিলাম* (ছ)। এটা কি সেই কথা নয় যা সুসমাচারে লেখা, যা অনুসারে যুদা অনুশোচনায় চালিত হয়ে টাকাগুলো ফিরিয়ে এনে তা মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন? (জ)। তিরস্কারমূলক ও নিন্দাজনক

মনোভাবে তিনি ঠিকই ‘*আমার মজুরি*’ বলেছিলেন; কেননা তিনি তাদের মধ্যে কতগুলো শুভকর্মই না সাধন করেছিলেন: তিনি অন্ধদের দিয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তি, খোঁড়াদের পা, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের হাঁটবার ক্ষমতা, এমনকি মৃতদের জীবন। এসমস্ত শুভকর্মের জন্য ওরা তাঁর মজুরি হিসাবে মৃত্যুই দিয়েছিল, এমন মৃত্যু যার মূল্য ত্রিশটা রুপোর টাকা বলে বিবেচিত। সুসমাচার একথাও বলে যে, তাঁকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, আর ভাববাণীর কণ্ঠ ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে একথাও পূর্বঘোষণা করেছিল, তথা, *তাদের আত্মাদের ধিক্! ‘এসো, সেই ধার্মিককে বেঁধে দিই, কারণ আমাদের জন্য সে অনর্থক’ একথা বলে ওরা নিজেরাই নিজেদের অমঙ্গল কল্পনা করল* (ঝ)।

২১। কিন্তু এবিষয়ে কেউ না কেউ বলতে পারে, এসমস্ত কথা কি প্রভুকেই লক্ষ করে বলে অনুধাবনযোগ্য? এমনটা কি হতে পারে যে, প্রভুকে মানুষ দ্বারা বন্দি অবস্থায় রাখা হয় বা বিচারে টানা হয়? এক্ষেত্রেও নবী তোমাকে নিশ্চিত করবেন, কেননা তিনি ঠিক একথা ব্যবহার করে বলেন, *প্রভু নিজেই জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের বিচারে আসবেন* (ক)। তাই, নবীর সাক্ষ্যদানমত প্রভুকে বিচার করা হয়, আর তাঁকে শুধু বিচার করা হয় না, তাঁকে কশাঘাত করা হয় ও মানুষের হাতের পাতা দিয়ে তাঁকে চড় মারা হয়, তাঁর গায়ে থুথু ফেলা হয়, ও আমাদের খাতিরে তিনি সমস্ত অপমান ও অবমাননার পাত্র হন। আর যেহেতু প্রেরিতদূতেরা তেমন কিছু প্রচার করলে সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত, সেজন্য তাঁদের হয়ে নবী বলে ওঠেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?* (খ)। কেননা এটাই অবিশ্বাস্য যে, ঈশ্বরের পুত্র যিনি, স্বয়ং ঈশ্বর যিনি, তিনি তেমন কিছু ভোগ করেছিলেন বলে প্রচারিত হবে ও তাঁর বিষয়ে তেমন কিছু বলা হবে। আর যারা বিশ্বাস করতে উদ্যত হচ্ছে, তাদের মনে যেন কোনও সন্দেহ না জাগে, সেজন্য নবীদের পূর্বঘোষিত বাণী সম্পর্কে তাদের অবগত করা হয়। অতএব খ্রিষ্ট প্রভু নিজেই নিজ থেকে বলেন, *আমার পিঠ কশাঘাতের জন্য, ও মানুষের হাতের পাতায় আমার গাল পেতে দিলাম; থুথুর লজ্জা থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিইনি* (গ)।

তাঁর যন্ত্রণাভোগ বৃত্তান্তে এও লেখা রয়েছে যে, তারা তাঁকে বেঁধে দিল ও পিলাতের কাছে নিয়ে গেল। এবিষয়টাও নবী এ বলে পূর্বঘোষণা করেছিলেন, *তাঁকে বেঁধে দেওয়ার পর তারা যারিম রাজার কাছে উপঢৌকন রূপে নিয়ে গেল* (ঘ)। কিন্তু কেউ না কেউ

আপত্তি করে বলবে, ‘কিন্তু পিলাত রাজা ছিলেন না’। তাই তুমি শোন সুসমাচার এরপরে কী বলে, *যখন পিলাত জানতে পারলেন, ইনি গালিলেয়ার মানুষ, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন* (ঙ)। এবং নবী ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সেই ‘যারিম’ নামটা যোগ করছেন যার অর্থ বন্য আঙুরলতা (চ) দাঁড়ায়, কেননা হেরোদ ইস্রায়েলকুলেরও মানুষ ছিলেন না, সেই ইস্রায়েলীয় আঙুরলতার অংশও ছিলেন না যা প্রভু মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন ও *একটা উপপর্বতে, উর্বরতম একটা স্থানে* (ছ) পুঁতেছিলেন; সুতরাং হেরোদ ছিলেন একটা বন্য আঙুরলতা অর্থাৎ এমন আঙুরলতা যা অজানা বংশের লতা। তাই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁকে ‘বন্য’ বলে অভিহিত করা হল যেহেতু তিনি কোনও কালেই ইস্রায়েলীয় সেই আঙুরলতার শাখা থেকে গজিয়ে ওঠেননি। এবং নবী ‘উপঢৌকন’ শব্দটাও উপযোগী ভাবে ব্যবহার করলেন, কেননা সুসমাচারের সাক্ষ্য অনুসারে, সেসময় হেরোদ ও পিলাত শত্রুতা ছেড়ে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন, ও তাঁদের পুনর্মিলনের উপঢৌকন হিসাবে তাঁরা একে অন্যকে যিশুকে বাঁধা অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আমাদের কী, যখন ত্রাণকর্তা হিসাবে যিশু বিরোধীদের পুনর্মিলিত করেন, শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, ও মিল ফিরিয়ে আনেন? আর এবিষয়ে যোব পুস্তকে এটাও লেখা রয়েছে, *প্রভু পৃথিবীর জননায়কদের মন পুনর্মিলিত করেন* (জ)।

২২। এমনটা বর্ণনা করা রয়েছে যে, যখন পিলাত তাঁকে মুক্তি দিতে চাচ্ছিলেন তখন জনগণ চিৎকার করে বলল, *ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও* (ক)। এবিষয়ও নবী যেরেমিয়া পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রভুর হয়ে বলেন, *আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে অরণ্যে সিংহের মত; আমার বিরুদ্ধে গর্জন করল, তাই এখন আমি তা ঘৃণা করি। আর সেজন্য আমি, তিনি যোগ করেন, আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি* (খ)। এবং অন্যত্র তিনি বলেন, *কার্ দিকে তোমরা মুখ বেঁকিয়েছ ও কার্ বিরুদ্ধে জিহ্বা মুক্ত করে দিয়েছ?* (গ)। লেখা আছে, তিনি বিচারিত হওয়ার সময়ে নীরব থাকলেন (ঘ)। এবিষয়ে শাস্ত্রে বহু সাক্ষ্যদান রয়েছে। সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *আমি তেমন মানুষের মত যে কিছুই শোনে না, যার মুখে কোন প্রতিবাদ নেই*; আরও, *‘বধিরের মত আমি শুনতাম না, আমি এমন বোবারই মত যে খোলে না মুখ* (ঙ)। এবং অন্য এক নবী বলেন, *লোমকাটিয়েদের সামনে নীরব মেষেরই মত তিনি খুললেন না মুখ; তাঁর নিজের*

অবমাননায় তাঁর বিচার তাঁর কাছ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল [জ]। লেখা রয়েছে, তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট দেওয়া হয়েছিল। এবিষয়ে পরম গীতে পিতা ঈশ্বরের কণ্ঠ শোন; তিনি আপন পুত্রের প্রতি যেরুশালেমের শঠতাপূর্ণ অপমানের বিষয়ে বিস্মিত হয়ে বলছেন, *হে যেরুশালেম কন্যারা, বেরিয়ে এসো, দেখ, তিনি সেই মুকুটে ভূষিত যা তাঁর মা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন* [ঝ]। তাছাড়া, এক একজন নবী কাঁটাগুলো উল্লেখ করেন, *আমি প্রত্যাশা করছিলাম, লতায় ফল ধরবে, কিন্তু ধরল কাঁটা, ও ধর্মময়তার বিনিময়ে ধরল চিৎকার* [ঞ]। তথাপি, যাতে তুমি রহস্যের গুপ্ত বিষয় জানতে পার, সেজন্য জগতের পাপ হরণ করতে এসেছিলেন যিনি, তাঁর পক্ষে এ প্রয়োজন ছিল যে, তিনি ভূমিকে সেই অভিশাপ থেকেও শোধন করবেন যা জগৎ সেই প্রথম মানুষের পাপের কারণে তখনই পেয়েছিল যখন তার অপরাধের রায় উচ্চারণ করে প্রভু বলেছিলেন, *তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ডে ভূমি অভিশপ্ত হোক। সে তোমার জন্য কাঁটা ও কাঁটাগাছ উৎপন্ন করবে* [ট]। তাই, যাতে সেই প্রথম দণ্ডের রায় মোচন করা যেতে পারে, সেজন্যই যিশুকে কাঁটার মুকুটে ভূষিত করা হয়। তিনি ক্রুশের দিকে চালিত হচ্ছেন ও গোটা জগতের জীবন সেই ক্রুশকাষ্ঠেই ঝোলানো হচ্ছে। তুমি কি ইচ্ছা কর, এবিষয়টাও নবীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হোক? শোন, যেরেমিয়া বলছেন, *এসো, তার রুটিতে একটা কড়িকাঠ দিই, ও জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি* [ঠ]। এবং মোশি পুনরায় তাদের উপর বিলাপ করে বলেন, *তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে ঝুলবে, দিবারাত্র তুমি শঙ্কার মধ্যে থাকবে, তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর কোন আস্থা থাকবে না* [ড]।

তথাপি আমাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, কারণ আমার সঙ্কল্পিত সংক্ষিপ্ততা-নিয়ম ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ও আমি আমার 'সংক্ষিপ্ত বাণী' এক দীর্ঘ ব্যাখ্যা দানে প্রসারিত করেছি। তাসত্ত্বেও আমি আরও দু'টো কথা বলব, পাছে এমনটা না মনে হয়, আমি যে দায়িত্বভার হাতে নিয়েছি, তা একেবারে অতিক্রম করেছি।

২৩। এমনটা লেখা রয়েছে যে, যিশুকে পাশে বিঁধিয়ে দেওয়া হলে জল ও রক্ত একসাথে নিঃসৃত হয়েছিল [ক]। এতে রহস্যময় অর্থ নিহিত, কেননা তিনি নিজে বলেছিলেন, *জীবনময় জলের নদনদী তার পেট থেকে উদ্গত হবে* [খ]। তিনি কিন্তু সেই রক্তও

ঝরিয়েছিলেন, যা বিষয়ে ইহুদীরা প্রার্থনা করেছিল যেন তা তাদের উপর ও তাদের সন্তানদের উপরে পড়ে (গ)। সেই অনুসারে তিনি জল ক্ষরিত করলেন যাতে বিশ্বাসীরা প্রক্ষালিত হয়, রক্তও ক্ষরিত করলেন যাতে অবিশ্বাসীরা দণ্ডিত হয়। কিন্তু আমরা এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি যে, জল ও রক্ত বাপ্তিস্মের দ্বিবিধ অনুগ্রহ পূর্বচিহ্নিত করছে: সেই প্রথম অনুগ্রহ যা বাপ্তিস্মের জল দ্বারা দেওয়া, ও সেই দ্বিতীয় অনুগ্রহ যা সাক্ষ্যমরণ দ্বারা রক্তক্ষরণে গৃহীত (ঘ), প্রকৃতপক্ষে দু'টোই বাপ্তিস্ম বলে অভিহিত। কিন্তু তুমি যদি আরও জিজ্ঞাসা কর, কেনই বা আমাদের প্রভু সম্পর্কে বলা হয়, তিনি অন্য কোনও অঙ্গ থেকে নয়, কিন্তু নিজের পাশ থেকেই রক্ত ও জল দু'টোই ক্ষরিত করলেন, তাহলে আমি মনে করি, পাঁজর সহ পাশটা নারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে (ঙ)। যেহেতু পাপ ও মৃত্যুর উৎস সেই প্রথম নারী থেকে উৎসারিত হয়েছিল যিনি আগে ছিলেন প্রথম আদমের পাঁজর, সেজন্য পাপক্ষমা ও জীবনের উৎস দ্বিতীয় আদমের পাঁজর থেকে উৎসারিত।

২৪। একথা লেখা রয়েছে যে, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত অন্ধকার হল (ক)। এবিষয়েও নবীর সাক্ষ্যদান গ্রহণ কর; তিনি বলেন, *মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত হবে* (খ)। নবী জাখারিয়াও বলেন, *সেইদিন আলো হবে না, এক দিনের জন্য শীত ও বরফ হবে; সেই দিনটা প্রভুর কাছে জ্ঞাত হবে, দিনও নয়, রাতও নয়, ও সন্ধ্যাবেলায় আলো হবে* (গ)। নবী যদি ইচ্ছা করতেন তাঁর বাণী ভবিষ্যতের পূর্বঘোষণা হিসাবে তত নয় বরং অতীতকালেরই বর্ণনা বলে বিবেচিত হবে, তাহলে তিনি এর চেয়ে স্পষ্টতর কোন্ ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন? তিনি তো শীত ও বরফের কথাই পূর্বঘোষণা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শীত করছিল বিধায়ই পিতর আগুন পোহাচ্ছিলেন (ঘ), আর তিনি কেবল আবহাওয়াজনিত শীত নয়, বিশ্বাসেরই শীত ভোগ করছিলেন। নবী একথাও যোগ করেন, *সেই দিনটা প্রভুর কাছে জ্ঞাত হবে, দিনও নয়, রাতও নয়* (ঙ)। এই 'দিনও নয়, রাতও নয়' আবার কী? তিনি কি সেই অন্ধকারের কথা স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করছিলেন না যে-অন্ধকার দিনের বেলায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ও তারপর আলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? সেটা দিন ছিল না, কেননা সেটা সূর্যোদয়ে শুরু হয়নি, সেটা প্রকৃত রাতও ছিল না, কেননা দিনের অবসানে সেটা শুরু থেকে নিজের

দৌড় আরম্ভ করেনি, দৌড়টাও শেষ পর্যন্ত প্রসারিত করেনি। কিন্তু সেই যে আলো ভক্তিহীনদের অপকর্ম দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল, সেই আলো সন্ধ্যাবেলায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেননা বেলা তিনটের পরে অন্ধকার বিতাড়িত হয়েছিল ও সূর্যকে পৃথিবীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্য একজন নবী একই কথা প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদান করে বলেন, *দিনের বেলায় পৃথিবী জুড়ে আলোকে অন্ধকারময় করা হবে* (চ)।

২৫। উপরন্তু সুসমাচার এমনটা বর্ণনা করে যে, সৈন্যেরা যিশুর জামাকাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করল ও তাঁর পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল (ক)। পবিত্র আত্মা এমনটা করেছিলেন যাতে নবীদের দ্বারা এবিষয়েও আগে থেকে সাক্ষ্যদান করা হয়, কেননা দাউদ বলেন, *ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করল ও আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল* (খ)। নবীরা সেই জামা সম্পর্কেও নীরব থাকলেন না যা বিষয়ে লেখা আছে সৈন্যেরা তাচ্ছিল্যের খাতিরে তা যিশুকে পরিয়েছিল; আমি সেই লাল জামার কথাই বলছি। এবিষয়ে ইশাইয়া যা বলেন, তা শোন, *ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন? যাঁর রক্তবর্ণ পোশাক বস্রা থেকে আসছে? … তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন? ও মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে, তোমার বসন তার বসনের মত কেন?* তাতে তিনি উত্তরে বলেন, '*মাড়াইকুণ্ডে আমি একাই আঙুর মাড়াই করলাম, হে সিয়োন কন্যারা* (গ)। কেননা একা তিনিই কোনও পাপকর্ম করেননি ও জগতের পাপ হরণ করলেন। কেননা যখন একজন দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করতে পারল, তখন গুরুতর কারণে কি জীবন ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না এমন একজন দ্বারা যিনি ঈশ্বরও ছিলেন? (ঘ)।

২৬। একথাও বর্ণনা করা রয়েছে যে, তাঁকে পান করার মত দেওয়া হয়েছিল সির্কা, বা গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররস, যা পিত্তের চেয়েও তিক্ত। এবিষয়ে, শোনো নবী কিনা পূর্বঘোষণা করেছিলেন; তিনি বলেন, *খাদ্যের জন্য ওরা আমাকে দিল পিত্ত, ও আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা* (ক)। এটার সঙ্গে মিল রেখে মোশি সেইকালেও আপন জনগণকে বলেছিলেন, *তাদের আঙুরলতা সদোমের আঙুরখেত থেকে উৎপন্ন, ও তাদের শাখাটা গমোরার খেত থেকেই উৎপন্ন; তাদের আঙুর পিত্তেরই*

আঙুর, ও তাদের আঙুরগুচ্ছ অতি তিক্ত (খ)। এবং অন্যত্র, তাদের তিরস্কার করে নবী বলেন, *এভাবেই নাকি তোমরা প্রভুকে প্রতিদান দাও, হে নির্বোধ ও প্রজ্ঞাহীন জাতি?* (গ)। তাছাড়া, গীতিকামালাতেও একই বিষয় পূর্বঘোষিত: সেখানে সেই বাগানের কথাও ইঙ্গিত করা হয় যেখানে প্রভুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, *বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার বাগানে প্রবেশ করেছি ও আমার গন্ধনির্যাস সংগ্রহ করেছি* (ঘ)। এখানে এটা স্পষ্ট যে, নবী সেই গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররসের কথা ঘোষণা করছেন যা পান করার জন্য প্রভুকে দেওয়া হয়েছিল।

২৭। শাস্ত্রে বলে যে এরপর *তিনি আত্মা ত্যাগ করলেন* (ক)। বিষয়টা আগে থেকে একজন নবী দ্বারা ঘোষিত হয়েছিল যিনি পুত্রের হয়ে পিতাকে বলেছিলেন, *তোমারই হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিই* (খ)। পরম্পরাগত শিক্ষা বলে, তিনি সমাহিত হয়েছিলেন ও প্রকান্ড একটা পাথর কবরের মুখে দেওয়া হয়েছিল। এবার ভাববাণীর সেই কণ্ঠও শোনো যা যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে এবিষয়ে আগে থেকে বলেছিল, *তারা আমার জীবনকে গহ্বরে একেবারে রুদ্ধ করল, ও আমার উপর একটা পাথর ফেলে দিল* (গ)। নবীর এবাণী তাঁর সমাধিদানের কথা অতিস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করে; কিন্তু অন্য বাণীও রয়েছে, *ধার্মিককে অনিষ্টের সামনে থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, ও তার স্থান শান্তিতে বিরাজ করে* (ঘ)। এবং অন্যত্র, *তার সমাধির খাতিরে আমি দুর্জনদের দান করব* (ঙ)। একই প্রকারে অন্যত্র, *তিনি শুইয়ে একটা সিংহ বা একটা যুবসিংহের মত নিদ্রা গেছেন; কে তাঁকে ওঠাবে?* (চ)।

২৮। তাছাড়া, তিনি যে পাতালে নেমে গেলেন, তাও সামসঙ্গীতে পূর্বঘোষিত যেখানে আমরা পড়ি, *তুমি মরণধুলায় শায়িত করেছ আমায়* (ক)। আরও, *আমার রক্তে কী লাভ যখন আমি সেই অবক্ষয়ে নেমে যাব?* (খ)। আরও, *পাঁকের গভীরে ডুবে গেছি, পা রাখার মত স্থান নেই* (গ)। তাছাড়া যোহন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *আপনি কি সেই ব্যক্তি যাঁর আসার কথা ছিল?* (অবশ্যই, পাতালেই আসবার কথা); *না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?* (ঘ)। এজন্যই পিতরও লিখেছিলেন, *মাংসে নিহত হয়ে কিন্তু তাঁর মধ্যে বাস করেন যিনি সেই আত্মায় সঞ্জীবিত হয়ে খ্রিষ্ট কারারুদ্ধ সেই আত্মাদের কাছে বাণীপ্রচার*

করতে নেমে গেছিলেন যারা নোয়ার সময়ে অবিশ্বাসী হয়েছিল [ঙ]; তাছাড়া, তিনি পাতালে যে কী করেছিলেন, এপদে তাও ঘোষিত। উপরন্তু, নবীর মধ্য দিয়ে, কেমন যেন ভাবীকালের কথা বলে, প্রভু নিজে বলেন, *তুমি আমার আত্মাকে পাতালে বিসর্জন দেবে না। না, তোমার পবিত্রজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না* [চ]। তিনি পুনরায় নবীয় ভাষায় কথা বলে কেমন যেন দেখান বিষয়টা ইতিমধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছে, *পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে নিয়েছ, প্রভু; যারা সেই গর্তে নেমে যায়, তাদের মধ্য থেকে তুমি ত্রাণ করেছ আমায়* [ছ]।

এরপর এটি আসে:

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান

২৯। **'তিনি তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন'**। খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের গৌরব সেই সমস্ত কিছু আলোকিত করল যা আগে দুর্বল ও ভঙ্গুর মনে হচ্ছিল। যদি একটু আগে তোমার এমনটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল যে অমর যিনি তিনি মৃত্যু পর্যন্তই পৌঁছবেন, এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ, যাঁর বিষয়ে বলা হয় তিনি মৃত্যুর উপর জয়ী হয়েছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, তিনি মরণশীল হতে পারেন না। কিন্তু এতে স্রষ্টার মঙ্গলময়তা বুঝে নাও, কেননা পাপ করায় তুমি যতখানি নিচে নিজেকে নামিয়ে দিয়েছ, তিনি তোমার পিছনে গিয়ে ততখানি নিচে নেমে গিয়েছেন। এবং সবকিছুর স্রষ্টা যিনি, সেই ঈশ্বরের উপর তুমি অসাধ্যতা আরোপ করো না এমন কথা ভেবে যে, তাঁর কর্ম সেই গহ্বরে পতিত হয়েছিল বিধায় নিঃশেষ হয়ে গেছিল যেহেতু পরিত্রাণকর্ম সাধন করার জন্য তিনি সেই গহ্বরে প্রবেশ করতে অক্ষম ছিলেন। আমরা অধোলোক ও ঊর্ধ্বলোকেরই কথা বলছি, কেননা আমরা দেহের নির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ রয়েছি ও আমাদের জন্য নির্ধারিত স্থানের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সর্বত্র বিদ্যমান ও কোথাও অনুপস্থিত যিনি, সেই ঈশ্বরের কাছে অধোলোক ও ঊর্ধ্বলোক কী। আসলে তিনি সেই দেহ ধারণ করায় এসমস্ত কিছুও স্থান পায়। যা কবরে রাখা হয়েছিল, সেই মাংস পুনরুত্থান করেছিল, নবী দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা যেন পূর্ণতা লাভ করতে পারে, *তোমার পবিত্রজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না* [ক]। তাই তিনি মৃতদের মধ্য থেকে

বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন ও সঙ্গে নিয়ে এলেন পাতালের লুণ্ঠিত সম্পদ। কেননা যাদের মৃত্যু দ্বারা বন্দি অবস্থায় রাখা হচ্ছিল, তিনি তাদের বের করে আনলেন (খ) যেইভাবে তিনি নিজে আগে থেকে বলেছিলেন, *আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (গ)। সুসমাচার এবিষয়ে তখনই সাক্ষ্যদান করে যখন বলে, *কবরগুলো খুলে গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ পুনরুত্থিত হল, বহু লোককে দেখা দিল, ও পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করল* (ঘ)। সেই দেহগুলো নিঃসন্দেহে সেই নগরীতেই প্রবেশ করল যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুশালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের সকলের জননী* (ঙ)। তিনি হিব্রুদের কাছেও পুনরায় বলেন, *যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, যিনি বহু সন্তানকে গৌরবে এনেছিলেন, তাঁর পক্ষে এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ করে তুলবেন* (চ)। অতএব, ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে তিনি নিজের দুঃখকষ্টের দ্বারা সিদ্ধতায় মণ্ডিত করা সেই মানব মাংসকে সেখানে অধিষ্ঠিত করলেন যা প্রথম মানুষের পাপের কারণে মৃত্যুতে পতিত হয়েছিল কিন্তু এখন পুনরুত্থানের পরাক্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেজন্য প্রেরিতদূতও বলেন, *তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন* (ছ)। কেননা তিনি ছিলেন সেই কুমোর, নবী যেরেমিয়ার শিক্ষা অনুসারে যিনি *যে পাত্র তাঁর হাত থেকে পড়েছিল ও টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল, তিনি তা পুনরায় নিজের হাতে তুলে নিয়ে নতুন করে গড়েছিলেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে তিনি ভাল মনে করেছিলেন* (জ)। আর তিনি এমনটা সমীচীন মনে করলেন যে, যে মরণশীল ও ক্ষয়শীল দেহ তিনি ধারণ করেছিলেন, সেই দেহকে পাথুরে কবর থেকে পুনরুত্থিত করে ও অমর ও অক্ষয়শীল করে তুলে এখন তা পৃথিবীতে নয়, স্বর্গধামে, তাঁর পিতার ডান পাশেই, অধিষ্ঠিত করবেন।

পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রবাণী তেমন রহস্যগুলোতে পরিপূর্ণ। কোনও নবী, কোনও বিধানকর্তা, কোনও সমসঙ্গীত রচয়িতাও নীরব নন, বরং পবিত্র পৃষ্ঠাগুলো প্রায়ই এক একটাই সেগুলো বিষয়ে কথা বলে। তাই মনে হচ্ছে, আরও সাক্ষ্যদান সঙ্কলন করার জন্য সময় ব্যয় করা অনর্থক; তবু আমি শুধু কয়েকটাই উল্লেখ করব, আর যারা আরও

বেশি পান করতে আগ্রহী, তাদের আমি খোদ ঐশপুস্তকাদির জলের উৎসধারায় যেতে আহ্বান করছি।

৩০। অতএব, সামসঙ্গীত-মালায়, শুরুতেই, আমরা এবচনটা পাই, *শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আবার জেগে উঠলাম, কারণ প্রভু ধরে রাখলেন আমায়* (ক)। আবার, অন্যত্র, *দীনহীনদের দুরবস্থা ও নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য এখন আমি উত্থিত হব, বলছেন প্রভু* (খ)। এবং যেইভাবে আগেও বলেছি, সেই অনুসারে অন্যত্র, *পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে এনেছ, প্রভু; যারা সেই গর্তে নেমে যায়, তাদের মধ্য থেকে তুমি ত্রাণ করেছ আমায়* (গ)। এবং অন্যত্র, '*আমার দিকে ফিরে তুমি আমাকে পুনরুজ্জীবিত করেছ, আমাকে পুনরুত্থিতই করেছ পৃথিবীর অতল থেকে* (ঘ)। ৮৭ নং সামসঙ্গীতে তাঁর বিষয়ে স্পষ্টতর কথা উল্লিখিত, *তিনি হয়েছেন এমন মানুষের মত যার কোন সাহায্য নেই, যে মৃতদের মধ্যে মুক্ত জন* (ঙ)। তিনি 'মানুষ' না বলে বরং 'মানুষের মত' বললেন, কেননা যখন তিনি পাতালে নেমে গেছিলেন, তখন 'মানুষের মত' ছিলেন, কিন্তু যেহেতু মৃত্যু তাঁকে ধরে রাখতে পারছিল না, সেজন্য তিনি ছিলেন 'মুক্ত জন'। তাই তাঁর একটা স্বরূপে মানব দুর্বলতা, ও অপর স্বরূপে ঐশমহিমার প্রতাপ প্রদর্শিত। তাছাড়া, নবী হোশেয়াও অধিক সুস্পষ্ট ভাষায় তৃতীয় দিনের কথা এভাবে ব্যক্ত করেন, *দু' দিন পরে তিনি আমাদের নিরাময় করবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে আমরা পুনরুত্থিত হব ও তাঁরই সাক্ষাতে জীবনযাপন করব* (চ)। তিনি একথা বলছেন তাদেরই হয়ে যারা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে মৃত্যু থেকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর তারা সেই একই ব্যক্তি যারা বলে, *আমরা পুনরুত্থিত হব ও তাঁরই সাক্ষাতে জীবনযাপন করব।* প্রকৃতপক্ষে ইশাইয়া স্পষ্টভাবে বলেন, '*যিনি মেষগুলোর সেই মহান পালককে পৃথিবী-গর্ভ থেকে বের করে আনলেন, তিনি* ... (ছ)। আরও, শাস্ত্রীরা, ফরিশীরা ও জনগণ অবিশ্বাস করতে করতে সেই স্ত্রীলোকেরা যে তাঁর পুনরুত্থান দেখতে পাবেন, একথাও ইশাইয়া এবচনে পূর্বঘোষণা করেছিলেন, *দর্শনলাভ থেকে ফিরে আসছ যে স্ত্রীলোকেরা, তোমরা এগিয়ে এসো, কারণ জনগণ নির্বোধ* (জ)। এমন একটা ভাববাণীও রয়েছে সেই স্ত্রীলোকদের বিষয়ে যাঁরা পুনরুত্থানের পরে কবরে গিয়েছিলেন ও তাঁকে না পেয়ে খোঁজ করেছিলেন; যেমন সেই মারীয়া মাগ্দালেনা যিনি, লেখা রয়েছে, আলো হবার আগে কবরে এসেছিলেন

ও তাঁকে না খুঁজে পেয়ে, যে দূতগণ সেখানে ছিলেন, তাঁদের কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, *কারণ ওরা প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে আমি জানি না* (ঋ); একথাও পরম গীতে পূর্বঘোষিত, *আমি আমার শয্যায়, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম; রাত্রিকালে তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না* (ঞ)। এবং যাঁরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁর পা ধরে রাখছিলেন, তাঁদের কথাও একই পুস্তকে উল্লিখিত, *আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসতেন, আমি তাঁকে ধরলাম ও তাঁকে ছাড়ব না* (ট)। বহু বচনের মধ্য থেকে এখানে যেগুলো উপস্থাপিত, সেগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকটা মাত্র; যেহেতু সংক্ষিপ্ততাই আমার প্রচেষ্টা, সেজন্য আরও বেশি সাক্ষ্যদান সঙ্কলিত করতে পারি না।

স্বর্গারোহণ ও আসনগ্রহণ

৩১। **'তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন, সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।'** বিশ্বাস-সূত্রের সমাপ্তি অংশে আসছে বলে এ সূত্র তিনটে উপযুক্ত সংক্ষিপ্ততায় ব্যক্ত। বচনগুলো যা ব্যক্ত করে তা যথেষ্টই স্পষ্ট, কিন্তু প্রশ্নটা হলো, যা বলা হচ্ছে তা কোন্ অর্থে বোঝা উচিত। কেননা, **'আরোহণ করলেন'**, **'আসীন আছেন'** ও **'আগমন করবেন'** শব্দত্রয় যদি ঐশস্বরূপের মর্যাদা অনুসারে ধরে নেওয়া না হয়, তবে এমনটা হতে পারে যে, শব্দত্রয় মানব দুর্বলতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে (ক)। কেননা পৃথিবীতে যা করার ছিল তিনি তা সমাধা ক'রে পাতালের বন্দিদশা থেকে আত্মাগুলোকে উদ্ধার করার পর তাঁর বিষয়ে বলা হয় তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন, যেইভাবে নবী পূর্বঘোষণা করে বলেছিলেন, *ঊর্ধ্বে আরোহণ করে তিনি বন্দিদশাকে বন্দি করে চালনা করলেন, মানুষকে দিলেন মঙ্গলদান* (খ), অর্থাৎ সেই মঙ্গলদানগুলো যা বিষয়ে প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে পিতর পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কথা বলে উল্লেখ করেছিলেন, *অতএব ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি এই দান বর্ষণ করেছেন যা তোমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ* (গ)। তিনি মানুষকে পবিত্র আত্মাকে দান রূপে অর্পণ করেছিলেন, কারণ দিয়াবল পাপের

দরুণ আগে যাদের পাতালে নিয়ে গেছিল, নিজের পুনরুত্থান দ্বারা খ্রিষ্ট সেই বন্দিদের মৃত্যু থেকে স্বর্গধামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন, এমন স্থানে নয় যেখানে বাণী-ঈশ্বর আগে কখনও ছিলেন না, কেননা তিনি সবসময়ই স্বর্গে ছিলেন ও পিতাতে থাকলেন, কিন্তু সেই স্থানে আরোহণ করলেন যেখানে মাংস-হওয়া-বাণী আগে কখনও আসন নেননি। তাছাড়া, যেহেতু স্বর্গের দ্বারে তেমন প্রবেশ তাঁর সেবাকর্মী ও নেতৃবৃন্দের কাছে নতুন মনে হচ্ছিল, সেজন্য মাংসের স্বরূপ যে স্বর্গের রহস্যময় গুপ্তস্থানে প্রবেশ করছে তা দেখে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ দাউদের মত তাঁরা একে অন্যকে বলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; তবে প্রবেশ করবেন গৌরবের রাজা। কে এই গৌরবের রাজা? শক্তিমান পরাক্রমী প্রভু, যুদ্ধে পরাক্রমী প্রভু* (ঘ)। এ কথাগুলো কিন্তু ঐশস্বরূপের পরাক্রমকে লক্ষ ক'রে নয়, ঈশ্বরের ডান পাশে আরোহণকারী মাংসের নবীনতাই লক্ষ করে উচ্চারিত। দাউদ একই কথা অন্যত্র বলেন, *ঈশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে* (ঙ)। কেননা যে কেউ বিজয়ী, সে তূর্যনিনাদের মধ্যেই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে অভ্যস্ত। তাঁর সম্পর্কে একথাও বলা হয়, *তিনি নিজের আরোহণকে স্বর্গে গেঁথে তোলেন* (চ)। আরও, *তিনি খেরুবদের উপর দিয়ে আরোহণ করলেন, বায়ুর পাখায় ভর করে উড়লেন* (ছ)।

৩২। তাছাড়া, **'পিতার ডান পাশে তাঁর আসীন'** হওয়াটাও তাঁর মাংসধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহস্য। কেননা মাংসের সেই আরোহণ ছাড়া একথা তাঁর অশরীরী স্বরূপের পক্ষে সমীচীন নয়, এবং স্বর্গধামে তাঁর আসীন হওয়ার সিদ্ধতাও এমন কিছু যা ঐশস্বরূপের নয় মানব স্বরূপেরই দরকার (ক)। সেজন্য তাঁর বিষয়ে বলা হয়, *তোমার রাজাসন আদি থেকেই প্রস্তুত, অনাদিকাল থেকেই তুমি বিরাজিত* (খ)। তাই, সেই যে আসনে প্রভু যিশুর আসীন হওয়ার কথা ছিল, তা অনাদিকল থেকেই প্রস্তুত ছিল; হ্যাঁ, সেই যিশু, *যাঁর নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হবে, ও যাঁর বিষয়ে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করবে যে, প্রভু যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে বিরাজমান* (গ)। এবিষয়ে দাউদও বলেন, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ* (ঘ)। ঠিক একথা লক্ষ করে প্রভু সুসমাচারে

ফরিশীদের বলেছিলেন, *দাউদ যখন আত্মায় তাঁকে প্রভু বলেন, তখন নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?* [ঙ]। এতে তিনি দেখাচ্ছিলেন যে, আত্মা অনুসারে তিনি ছিলেন প্রভু, মংস অনুসারে ছিলেন দাউদসন্তান। সেজন্য প্রভুও অন্যত্র বলেছিলেন, *আমি সত্যি সত্যি তোমাদের বলছি, এখন থেকে তোমরা মানবপুত্রকে ঈশ্বরের পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে* [চ]। এবং প্রেরিতদূত পিতর খ্রিষ্ট সম্পর্কে বলেন, *তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে স্বর্গে আসীন রয়েছেন* [ছ]। পলও এফেসীয়দের কাছে লিখে বলেন, *তাঁর শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে, যা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন* [জ]।

পুনরাগমন ও বিচার

৩৩। তিনি যে জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আগমন করবেন, এবিষয়ে আমরা ঐশশাস্ত্রের বহু সাক্ষ্যদান দ্বারা উদ্বুদ্ধ রয়েছি। কিন্তু এবিষয়ে নবীরা যা যা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তা ব্যক্ত করার আগে বিশ্বাসের সেই পরম্পরা সম্পর্কে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি, সেই যে পরম্পরা বিচারকের আগমন সম্পর্কে প্রতিদিন আমাদের তৎপর করতে অভিপ্রেত, যাতে আমরা আমাদের আচরণ এমন ভাবে প্রস্তুত করি কেমন যেন আমরা আসন্ন বিচারকের কাছে কৈফিয়ত দিতে উদ্যত। কেননা সুখী মানুস সম্পর্কে নবী ঠিক তাই বলেছিলেন, '*সে বিচারের উদ্দেশ্যেই নিজের কথা সাজায়* [ক]। তথাপি, সূত্রটা যখন বলে, তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন, তখন এমনটা বোঝায় না যে, জীবিত কয়েকজন ও মৃত কয়েকজন বিচারে আসবে, বরং সূত্রটার অর্থ হল, তিনি আত্মা ও দেহ দু'টোই একসাথে বিচার করবেন; এক্ষেত্রে আত্মাগুলো জীবিত বলে, ও দেহগুলো মৃত বলে উল্লিখিত। এবিষয়ে প্রভু নিজেও সুসমাচারে বলেন, *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু আত্মাকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি আত্মা ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন* [খ]।

৩৪। এবার, তুমি সম্মত হলে তবে এসো, আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখাব কেমন করে এসমস্ত কিছু নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল। তুমি ইচ্ছা করলে তবে নিজেই শাস্ত্রের উদারতা থেকে আরও বেশি সাক্ষ্যদান সংগ্রহ করতে পারবে। সুতরাং, নবী মালাখি বলেন, *ওই দেখ, সর্বশক্তিমান প্রভু আসবেন, আর কে তাঁর আগমনের দিন সহ্য করতে পারবে? বা তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধক চুল্লির আগুনের মত, ও রজকের ঘাসের মত। আর তিনি বসে সোনা ও রুপোই যেন তা নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন* (ক)। কিন্তু, যাঁর বিষয়ে এসমস্ত কিছু বলা হচ্ছে, সেই প্রভু যে কে, তা যেন তুমি আরও স্পষ্ট ভাবে জানতে পার, সেজন্য নবী দানিয়েল যা বলেন তাও শোনো; তিনি বলেন, *আমি রাত্রিবেলায় দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন: তিনি বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল; ও তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার; সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ থাকবে; তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব যা কখনও লোপ পাবে না, এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না* (খ)। এ থেকে আমরা তাঁর আগমন ও তাঁর বিচার সম্পর্কে শুধু নয়, তাঁর কর্তৃত্ব ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কেও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি, যেমন, তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন ও তাঁর রাজ্য অক্ষয়শীল ও অন্তহীন, ঠিক সেইভাবে যেভাবে বিশ্বাস-সূত্রে বলা হয়, তথা, **'তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন'**(গ)। তাই যে কেউ এমনটা সমর্থন করে যে, একদিন খ্রিষ্টের রাজ্যের অন্ত হবে, সে বিশ্বাস থেকে বহু দূরে রয়েছে। তথাপি আমাদের জানা উচিত যে, বিশ্বস্তদের প্রবঞ্চিত করার বাসনায় সেই শত্রু খ্রিষ্টের এই পরিত্রাণদায়ী আগমন জাল করার জন্য চতুরতাপূর্ণ উপায় কাজে লাগায়। যিনি আপন পিতার মহিমায় আগমন করবেন বলে প্রত্যাশিত, সেই মানবপুত্রের স্থানে সেই শত্রু খ্রিষ্টের বদলে খ্রিষ্টবৈরীকেই জগতে অনুপ্রবেশ করার লক্ষে অলৌকিক লক্ষণ ও মিথ্যা চিহ্নকর্ম সহ বিনাশ-সন্তানকে আগে আগে পাঠাবে। এরই বিষয়ে প্রভু নিজে সুসমাচারে ইহুদীদের সতর্ক করেছিলেন, *আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু তোমরা আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত নও; অন্য কেউ নিজের নামে এলে তাকেই বরং তোমরা গ্রহণ করবে* (ঘ)। এবং অন্যত্র তিনি বলেন, *যখন তোমরা দেখবে, নবী দানিয়েল যে*

সর্বনাশা জঘন্য বস্তুর কথা বলেছিলেন তা পবিত্র স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তখন পাঠক ব্যাপারটা বুঝে নিক [ঙ]।

নিজের দর্শনগুলোতে দানিয়েল এই ভ্রান্তির আগমন সম্পর্কে যথেষ্ট ও নির্দিষ্ট বর্ণনা দেন, কিন্তু সেবিষয়ে উদাহরণ উপস্থাপন করা অধিক ক্লান্তিকর ব্যাপার হবে যেহেতু ইতিমধ্যে আমি এবিষয়ে যথেষ্ট কথা বলেছি। তথাপি প্রেরিতদূত নিজে বলেন, *কেউ আদৌ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা প্রথমে সেই মহা বিদ্রোহ দেখা দেবে, এবং জঘন্য কর্মের সেই পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তানও আবির্ভূত হবে, সেই যে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এবং যা কিছু ঈশ্বর বলে অভিহিত বা যা কিছু আরাধনার পাত্র, সেইসব কিছুর উপরে নিজেকে উন্নীত করবে, এমনকি ঈশ্বরের পবিত্রধামে আসন নিয়ে নিজেকেই ঈশ্বর বলে দাবি করবে* [চ]। এবং কয়েক পদের পর তিনি বলে চলেন, *তখনই সেই জঘন্য কর্মের সাধক প্রকাশিত হবে, এবং প্রভু যিশু নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে তাকে ধ্বংস করবেন ও নিজের আগমনের গৌরবময় আবির্ভাবে তাকে নস্যাৎ করে দেবেন; সেই জঘন্য কর্মের সাধকের আগমন শয়তানের কর্মশক্তি অনুসারে সাধিত সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে* [ছ]। এবং কয়েক পদের পরে, একই সুরে, তিনি বলেন, *এজন্য ঈশ্বর তাদের উপর ভ্রান্তিময় কর্মশক্তি পাঠান, যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে, এর ফলে যেন সেই সকলেই বিচারিত হয়, যারা সত্যে বিশ্বাস রাখল না* [জ]। নবীদের, সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের মুখ দিয়ে আমাদের কাছে তেমন ভ্রান্তি ঘোষণা করার কারণ এটি হল, যাতে কেউই খ্রিষ্টবৈরীর আগমনকে খ্রিষ্টের আগমন বলে ভুল না বোঝে। প্রভু নিজেই তো বলেন, *তখন কেউ যদি তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রিষ্ট এখানে, কিংবা ওখানে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না, কেননা নকল খ্রিষ্টেরা ও নকল নবীরা উঠবে যারা অনেককে ভোলাবে* [ঝ]। তথাপি এসো, এবার দেখি তিনি কেমন করে প্রকৃত খ্রিষ্টের বিচার বিষয়ে প্রমাণ দিলেন, *বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে* [ঞ]। তাই যখন প্রকৃত প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আগমন করবেন, তখন তিনি আসন নেবেন ও বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, সেইভাবে যেভাবে তিনি নিজে সুসমাচারে বলেন, *তিনি ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করবেন* [ট], অর্থাৎ অধার্মিকদের থেকে ধার্মিকদের পৃথক করবেন, যেইভাবে প্রেরিতদূতও এবিষয়ে

লেখেন যে, *কারণ আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়* (ঠ)। তাছাড়া, বিচারটা কেবল কর্ম সংক্রান্ত হবে না, চিন্তা-ভাবনাও বিচারের বস্তু হবে, যেইভাবে একই প্রেরিতদূত বলেন, ... *তাদের নিজেদের চিন্তা-ধারণাই হয় তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে: সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন* (ড)। এসমস্ত বিষয়ে একথা যথেষ্ট হোক। সূত্রমালার অনুক্রম অনুসারে এবার আসছে:

পবিত্র আত্মা

৩৫। **'এবং আমি পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]'**। যা কিছু উপরে যথেষ্ট উদার ভাবে খ্রিষ্ট সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর মাংস হওয়া ও যন্ত্রণাভোগ রহস্য লক্ষ করে। যেহেতু সেই সমস্ত কিছু তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা এমন প্রতিবন্ধক (ক) সৃষ্টি করেছে যা পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত উপস্থাপনা বিলম্বিত করেছে। যদি আমাদের বিষয়বস্তু কেবল তাঁর ঈশ্বরত্বই সংক্রান্ত হত, তবে আমরা সরাসরি বলতাম, **'সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে'** ইত্যাদি, ও পরপরে বলতাম, **'তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে'**; এবং এরপর একই পদ্ধতি পালন করে আমরা ইতস্তত না করে **'এবং পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি'** বচনটা যোগ করতাম। কিন্তু খ্রিষ্ট সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্ব বিষয়ে আমরা উপরে কথা বলেছি, সেগুলো 'মাংস' ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়, যেমনটা আগেও বলেছিলাম। তাই আমরা পবিত্র আত্মার কথা উল্লেখ করায় ত্রিত্ব রহস্যটা সিদ্ধ করে তুলি। কেননা যেমন পিতা এক বলে চিহ্নিত আর অন্য কোনও পিতা নেই, ও একমাত্র-জনিত পুত্র এক বলে চিহ্নিত আর অন্য কোনও একমাত্র-জনিত পুত্র নেই, তেমনি পবিত্র আত্মাও এক আর অন্য কোনও পবিত্র আত্মা থাকতে পারে না। সুতরাং, ব্যক্তিত্রয়কে যেন নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, সেজন্য সম্পর্ক সংক্রান্ত শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন, যার ফলে প্রথম ব্যক্তি পিতা বলে উপলব্ধ, যাঁর কাছ থেকে সবকিছু আগত ও যাঁর কোনও পিতা নেই; দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন পুত্র যেহেতু তিনি পিতা থেকে সঞ্জাত; এবং তৃতীয়

ব্যক্তি হলেন পবিত্র আত্মা যেহেতু তিনি ঈশ্বরের মুখ থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন ও সমস্ত কিছু পবিত্রিত করে থাকেন। একই সময়ে, এ সত্য শেখাবার জন্য যে, ত্রিত্বে ঈশ্বরত্ব এক ও একই, সেজন্য আমরা যেমন **'পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি'** বলে ঈশ্বর-এ যোগ করে থাকি, তেমনি আমরা **'তাঁর পুত্র খ্রিষ্ট-এ'** ও সেইভাবে **'পবিত্র আত্মা-য়'**ও বলে থাকি। যাই হোক, আমি যা বলে এসেছি, তা পরবর্তী ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হবে। এবার, এবচনের পর পর এ কথাগুলো আসে,

৩৬। **'পবিত্র মণ্ডলী, পাপের ক্ষমা, এই মাংসের পুনরুত্থান।'** সূত্রটা 'পবিত্র মণ্ডলীতে', বা 'পাপের ক্ষমায়' বা 'এই মাংসের পুনরুত্থানে' বলে না। যদি শব্দ-শেষে এ-কার, '-তে' বা 'য়' যোগ দেওয়া থাকত, তবে এ সূত্রত্রয়ের শক্তি আগেকার সূত্রগুলোর একই শক্তি হত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, যেখানে ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাস ঘোষিত, সেখানে আমরা **'পিতা ঈশ্বরে'** ও **'তাঁর পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে'** ও **'পবিত্র আত্মায়'**, কিন্তু বাকি সবকিছুর জন্য যেহেতু আমরা ঈশ্বরত্বের কথা নয়, সৃষ্টবস্তু ও রহস্যগুলো সম্পর্কেই কথা বলি, সেজন্য শব্দ-শেষে **এ-কার** বা **'-তে'** বা **'য়'** যুক্ত করা হয় না: আমাদের তো পবিত্র মণ্ডলীতে নয়, পবিত্র মণ্ডলীকে বিশ্বাস করতে হয়, এমন মণ্ডলী যা ঈশ্বর বলে নয় বরং ঈশ্বর দ্বারা সংগৃহীত মণ্ডলী বলে বিশ্বাসের বিষয়। তাই খ্রিষ্টিয়ানেরা পাপের ক্ষমায় নয়, কিন্তু পাপের ক্ষমা যে আছে তাই বিশ্বাস করে; একই প্রকারে তারা মাংসের পুনরুত্থানে নয়, কিন্তু মাংসের পুনরুত্থান যে আছে তাই বিশ্বাস করে। তাই ব্যাকরণমূলক এ পার্থক্য দ্বারা স্রষ্টাকে সৃষ্টবস্তু থেকে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়, এবং ঐশবস্তু বিষয়াদি মানব বিষয়াদি থেকে পৃথক করা হয়।

তাই এই পবিত্র আত্মাই তিনি, যিনি পুরাতন নিয়মে বিধান ও নবীদের, ও নূতন নিয়মে সুসমাচারগুলোকে ও প্রেরিতদূতদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এবং ধর্মশিক্ষার জন্য তার উপযোগিতা আছে* [ক]। ফলে, পিতৃগণের পরম্পরা থেকে আমরা যেভাবে শিখেছি, সেই অনুসারে এখন নূতন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর তালিকা উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করি; এমন পুস্তকগুলো যা আমাদের পূর্বপুরুষদের [খ] পরম্পরা অনুসারে আমরা

পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে বিশ্বাস করি, ও যা খ্রিষ্টের মণ্ডলীগুলোর কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে।

বাইবেলের পুস্তকাদির পবিত্র কানুন অনুযায়ী তালিকা

৩৭। অতএব, পুরাতন নিয়মে, সর্বপ্রথমে, মোশির পাঁচটা পুস্তক সম্প্রদান করা হয়েছে তথা আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ। পরে, নাবের সন্তান যিশু [অর্থাৎ নূনের সন্তান যোশুয়া], রুথ সহ বিচারকগণ। পরে, রাজাবলির চারটে পুস্তক যা হিব্রুরা দু'টো পুস্তক বলে গণ্য করে; পারালিপমেন (ক) যা দিবসগুলো (খ) পুস্তক বলেও অভিহিত, এজরার দু'টো পুস্তক যা হিব্রুরা এক পুস্তক বলে গণ্য করে, এবং এস্থার। নবীদের পুস্তকাদি: ইশাইয়া, যেরেমিয়া, এজেকিয়েল ও দানিয়েল; তাছাড়া দ্বাদশ নবীর এক পুস্তক। যোব-ও, ও দাউদের সামসঙ্গীত-মালা, যা এক একটা এক পুস্তক বলে গণ্য; শলোমন মণ্ডলীগুলোর কাছে তিনটে পুস্তক রেখে গেছেন তথা প্রবচনমালা, উপদেশক, পরম গীত। এগুলো নিয়ে পুরাতন নিয়ম সিদ্ধ।

নূতন নিয়মে রয়েছে চারটে সুসমাচার: মথি, মার্ক, লুক, যোহন; লুখ লিখিত প্রেরিতদের কার্যবিবরণী; প্রেরিতদূত পলের চৌদ্দ পত্র, প্রেরিতদূত পিতরের দু'টো পত্র, প্রভুর ভাই ও প্রেরিতদূত যাকোবের একটা পত্র, যুদার একটা পত্র, যোহনের তিনটে পত্র, যোহনের ঐশপ্রকাশ (গ)। এগুলো হলো সেই পুস্তক যেগুলো পিতৃগণ কানুন অনুযায়ী তালিকায় (ঘ) অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ও যেগুলোর উপরে আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণসমূহ ভিত্তি করবে বলে তাঁরা ইচ্ছা করেছিলেন।

৩৮। কিন্তু একথা জানা উচিত যে, অন্যান্য পুস্তকও রয়েছে যেগুলো আমাদের পূর্বসূরীগণ 'কানুন অনুযায়ী' নয়, 'মণ্ডলীগত'-ই (ক) বলে অভিহিত করেছিলেন; তথা, শলোমনের প্রজ্ঞা বলে অভিহিত প্রজ্ঞা পুস্তক, ও আর একটা প্রজ্ঞা যা সিরাখের ছেলের প্রজ্ঞা [বেন-সিরা] বলে অভিহিত। এ পুস্তক লাতিনদের দ্বারা 'এক্লেসিয়াস্তিকুস'(খ) সাধারণ নাম দ্বারাও চিহ্নিত; নামটা পুস্তকের লেখকের নাম নয়, লেখার স্বভাবই বরং চিহ্নিত করে। একই শ্রেণিতে রয়েছে তোবিত, যুদিথ ও মাকাবীয় পুস্তকগুলো। নূতন

নিয়মে সেই পুস্তিকা রয়েছে যা পালকের পুস্তক বা হের্মাস [গ] বলে অভিহিত, সেই পুস্তক যা 'দু'টো পথ'[ঘ] বলে অভিহিত, ও পিতরের বিচার [ঙ]। পিতৃগণ বাসনা করছিলেন, এ সমস্ত পুস্তক মণ্ডলীর সমাবেশে পাঠ করে শোনানো হবে, কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় ক্ষেত্রে এ পুস্তকগুলোর উপর অধিকার রাখতে নেই। অন্যান্য যত পুস্তক তাঁরা 'আপক্রিফুস'[চ] পুস্তক বলে অভিহিত করলেন; কিন্তু এমনটা চাইলেন না সেগুলো মণ্ডলীর সমাবেশে পাঠ করা হবে।

অতএব, এটিই সেই পরম্পরা যা আমাদের পিতৃগণ আমাদের কাছে সম্প্রদান করে এসেছেন। উপরেও যেমন বলেছি, আমি এস্থানেই তা উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করেছি , যারা মণ্ডলীর ও বিশ্বাসের প্রাথমিক বিষয়গুলো সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদেরই শিক্ষার লক্ষ্যে, তারা যেন জানতে পারে ঈশ্বরের বাণীর কোন্ উৎসধারা থেকে জল তুলে আনা উচিত।

পবিত্র মণ্ডলী

৩৯। বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর অনুক্রমে পরবর্তী সূত্র হল, **'পবিত্র মণ্ডলী'**। আমি ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী সূত্রে ব্যাখ্যা করেছি কেনই বা এখানেও 'পবিত্র মণ্ডলীতে' বলা হয় না। তাই ত্রিত্ব রহস্য ক্ষেত্রে যারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শিক্ষা পেয়েছিল, তাদের এটাও বিশ্বাস করতে হয় যে, পবিত্র এক মণ্ডলী আছে যেখানে বিশ্বাস এক ও বাপ্তিস্ম এক, যেখানে পিতা এক ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্ট এক প্রভু ও এক পবিত্র আত্মা বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়।

এটি সেই পবিত্র মণ্ডলী যার *কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা নেই* [ক]। কেননা অন্য অন্য অনেকেই নিজ নিজ মণ্ডলীগুলো সংগ্রহ করেছেন যেমন মার্কিওন, বালেন্তিনুস [খ], এবিওন, মানিখোউস, আরিউস ও সেই অন্যান্য সকল ভ্রান্তমতপন্থী। কিন্তু সেই মণ্ডলীগুলো অবিশ্বাসজনিত কলঙ্ক বা বলিরেখা থেকে মুক্ত নয়। আর সেজন্য তাদের বিষয়ে নবী বলেন, *আমি অপকর্মাদের মণ্ডলীকে ঘৃণা করেছি, বসব না দুর্জনদের সঙ্গে* [গ]। কিন্তু এই যে মণ্ডলী খ্রিষ্টবিশ্বাস অক্ষুণ্ন রক্ষা করে, তার সম্পর্কে শোনো পবিত্র আত্মা পরম গীতে কী বলেন, *আমার কপোতী এক; তার জননীর শুদ্ধমতী অনন্যা* [ঘ]।

অতএব, যে কেউ মণ্ডলীতে এ বিশ্বাস গ্রহণ করে, সে *অসারের সভায়* বিপথে না যাক, *অপকর্মাদের সংসর্গে* [ঙ] প্রবেশ না করুক।

কেননা মার্কিওনের জনসমাবেশ এতেই '*অসারের সভা*' যেহেতু সে অস্বীকার করে, খ্রিষ্টের পিতা হলেন স্রষ্টা সেই ঈশ্বর যিনি নিজের পুত্র দ্বারা জগৎকে গড়লেন [চ]। এবিওনের [ছ] জনসমাবেশ '*অসারের সভা*' যেহেতু সে এমনটা শেখায় যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ায় আমাদের মাংসের পরিচ্ছেদন, শাব্বাৎ-পালন, বলিদান প্রথা, ও বিধানের অক্ষর অনুযায়ী বাকি সমস্ত বিধিনিয়ম রক্ষা করা উচিত। মানিখেউসের [জ] জনসমাবেশ নিজের শিক্ষাদান সম্পর্কে '*অসারের সভা*' : প্রথমত, সে নিজেকে 'সেই সহায়ক' অভিহিত করে, তারপর সে নাকি বলে, জগৎ অমঙ্গলময় ঈশ্বরত্ব দ্বারা গড়া হয়েছে, স্রষ্টা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, পুরাতন নিয়ম প্রত্যাখ্যান করে, দু'টো স্বভাব সমর্থন করে, শুভ একটা ও অশুভ একটা, যা একে অন্যের বিরোধী; তাছাড়া সে বলে, মানুষদের আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অনন্তকালীন, ও পিতাগোরাসপন্থীদের অভিমত অনুসারে আত্মাগুলো নানা পুনর্জন্ম-চক্রের মধ্য দিয়ে গোবাদি, পশু ও বন্য জন্তুর মধ্যে ফিরে যায়; সে আমাদের মাংসের পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে, এমনটা উপস্থাপন করে যে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও জন্মগ্রহণ প্রকৃত ভাবে ঘটেনি, বরং ছিল ছদ্মবেশেরই ব্যাপার মাত্র। সেটাও '*অসারের সভা*', যেটায় সামোসাতার পল [ঝ] ও তার উত্তরসূরী ফতিনুস [ঞ] পরবর্তীকালে এমনটা শেখাত যে, খ্রিষ্ট জগতের পূর্বে পিতা থেকে সঞ্জাত হননি, বরং তাঁর উদ্ভব হয়েছিল মারীয়া থেকে; তাছাড়া, তিনি যে ঈশ্বর হওয়ায় মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন তা বিশ্বাস করত না, বরং এ বিশ্বাস করত যে, তিনি একটা মানুষমাত্র যিনি ঈশ্বর হয়েছিলেন। এটাও '*অসারের সভা*', যেটায় আরিউস ও এউনোমিউস [ট] নিজ নিজ নির্দিষ্ট অভিমত অনুসারে শেখাল যে, ঈশ্বরের পুত্র পিতার প্রকৃত সত্তা থেকে জন্ম নেননি বরং অস্তিত্ববিহীন অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং এও শেখাত যে, ঈশ্বরের পুত্রের আদি আছে ও তিনি পিতার নিম্নতর অবস্থার অধিকারী; তাছাড়া, তারা এও সমর্থন করে যে, পবিত্র আত্মা পুত্রের নিম্নতর অবস্থার শুধু নয়, তিনি বরং পুত্রের প্রতিনিধি মাত্র। '*অসারের সভা*' এও স্বীকার করে যে, পুত্র পিতার সত্তা হতে উদ্গত ঠিকই, কিন্তু তারা পবিত্র আত্মাকে পৃথক আলাদা একটা শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ করে [ঠ], আর তারা তেমনটা

করে যদিও ত্রাণকর্তা সুসমাচারে দেখান, ত্রিত্বের পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব এক ও একই; সেসময় তিনি বলেছিলেন, *পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে সকল জাতিকে বাপ্তিস্ম দাও* (ড)। ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষের পক্ষে তা বিযুক্ত করা একেবারে নিন্দাজনক কাজ। এটাও '*অসারের সভা*', যেটা জেদী ও ধূর্ত যুক্তিকে একসময় সংগৃহীত ক'রে সমর্থন করল যে, খ্রিষ্ট মানব মাংস ধারণ করলেন ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন আত্মাকে ধারণ করেননি, যদিও তিনি মাংসের উপরে, প্রাণের উপরে ও মানুষের যুক্তিক্ষমতা ও মনের উপরে এক ও একই পরিত্রাণ আরোপ করলেন (ঢ)। সেটাও '*অসারের সভা*', যেটাকে দনাতুস (ণ) আফ্রিকা জুড়ে একত্রে সমবেত করেছিল: মণ্ডলী [নির্যাতনকারীদের হাতে] পবিত্র শাস্ত্র সঁপে দিয়েছিল, এ ছিল মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ; তাছাড়া একই '*অসারের সভায়*' নভাতুস (ত) [নির্যাতনকালে] পতিত হয়েছিল যারা, তাদের কাছে মনপরিবর্তনের সুযোগদান অস্বীকার ক'রে ও প্রয়োজনের জোরেও সম্পাদিত দ্বিতীয় বিবাহকে দণ্ডিত ক'রে মানুষদের মন আলোড়িত করেছিল।

তাই তুমি এদের সকলের কাছ থেকে অপকর্মাদের মণ্ডলী থেকেই যেন দূরে থাক। তাদেরও কাছ থেকে দূরে থাক (তেমন মানুষই যদি বা থাকে) যাদের বিষয়ে নাকি বলা হয়, তারা এমনটা সমর্থন করে যে, ঈশ্বরের পুত্র যেমন পিতা দ্বারা জ্ঞাত ও দৃষ্ট, তিনি সেইমত পিতাকে দেখেন না ও জানেন না; অথবা, যারা বলে, খ্রিষ্টের রাজ্যের অন্ত হবে, অথবা, মাংস নিজের সত্তার পূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পুনরুত্থান করবে না। একই প্রকারে, তাদেরও কাছ থেকে দূরে থাক, যারা অস্বীকার করে, সকলের প্রতি ঈশ্বরের ভাবী ন্যায়বিচার হবে, ও সমর্থন করে যে, দিয়াবলকে তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে মুক্ত করা হবে। আবার বলছি, বিশ্বস্ত যারা, তারা যেন এ সকলের প্রতি কান না পাতে (থ)। কিন্তু তুমি সেই পবিত্র মণ্ডলীকে আঁকড়িয়ে ধরে থাক যে মণ্ডলী অনন্য সুসঙ্গত ও অনুরূপ সত্তার অধিকারী সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরকে, তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিষ্ট আমাদের সেই প্রভুকে, ও পবিত্র আত্মাকে স্বীকার করে, ঈশ্বরের পুত্র যে কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, মানুষের পরিত্রাণার্থে যন্ত্রণাভোগ করলেন, যে মাংসে জন্ম নিয়েছিলেন সেই একই মাংসে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তা বিশ্বাস করে।

অবশেষে, পবিত্র মণ্ডলী প্রত্যাশা করে, যাঁর মধ্য দিয়ে **পাপের ক্ষমা** (দ) ও **মাংসের পুনরুত্থান** প্রচারিত, তিনি সকলের বিচারকর্তা রূপে আসবেন।

পাপের ক্ষমা

৪০। **'পাপের ক্ষমা'** এর ব্যাপারে বিশ্বাস-ই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা এক শাসকর্তার মঙ্গলময়তার সামনে কেইবা সেটার কারণ বা সেটার ব্যাখ্যা আদায় করবে? যখন পার্থিব এক রাজার উদারতা তর্কাতর্কির বিষয় নয়, তখন কি মানুষের অভিমান ঈশ্বরের বদান্যতা বিষয়ে তর্ক করবে? বস্তুতপক্ষে বিজাতীয়রা প্রায়ই আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করে (ক), একথা বলে যে আমরা তখনই নিজেদের প্রবঞ্চনা করি যখন আমরা মনে করি, বাস্তবে কৃত অপকর্ম কথার দ্বারা মুছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তারা তো বলে থাকে, যে নরহত্যা করেছে, এমনটা কি হতে পারে যে সে নরঘাতক নয়? যে ব্যভিচার করেছে, তাকে কি ব্যভিচারী নাও গণ্য করা যায়? তবে যে কেউ তেমন ধরনের অপকর্মের জন্য দায়ী, কেমন করে তাকে হঠাৎ করে পবিত্র করা হয়?

কিন্তু আমি যেমনটা বলেছি, এক্ষেত্রে আমরা যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস দ্বারাই শ্রেয়তর উত্তর দিই। কারণ যিনি ক্ষমা দানের অঙ্গীকার করেছেন, তিনি সবকিছুর রাজা; এব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত করেন যিনি তিনি স্বর্গমর্তের প্রভু। তুমি কি এমনটা ইচ্ছা কর না, আমি বিশ্বাস করব, আমাকে মাটি থেকে গড়েছেন যিনি তিনি দোষী এই আমাকে নিরপরাধী করে তুলবেন? এবং আমি এও বিশ্বাস করব যে, আমি অন্ধ থাকতে আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন যিনি, বা আমি কালা থাকতে আমাকে শ্রবণশক্তি দিয়েছেন যিনি, বা খোঁড়া এই আমাকে হাঁটতে দিয়েছেন যিনি তিনি আমার হারানো নিরপরাধিতা পুনরুদ্ধার করবেন? এবার খোদ প্রকৃতির সাক্ষ্যদান ধরি। একটা মানুষকে হত্যা করা যে সবসময় অপকর্ম এমন নয়, কিন্তু বিধান মতে নয়, কুসঙ্কল্পে হত্যা করা-ই অপকর্ম। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কর্মটাই যে আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে এমন নয়, কারণ মাঝে মাঝে কর্মটা ন্যায়ত কৃত, বরং মনের সঙ্কল্পটাই আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে (খ)। তবে সেই যে মনকে অপকর্মা করা হয়েছে ও সেই যে মনে পাপ উদ্ভূত হয়েছে,

সেই মনকে যদি সংশোধন করা হয়, তাহলে সেই যে আমি আগে অপকর্মা ছিলাম, তোমার কাছে কেনই বা সেই আমিকে নিরপরাধী করে তোলা অসম্ভব মনে হতে পারে? কেননা, আমি যেমন উপরে দেখিয়েছিলাম, যদি এটাই স্পষ্ট যে, অপকর্ম কর্মে নয় কিন্তু ইচ্ছাতেই অবস্থিত, তবে যেইভাবে সেই অমঙ্গলময় অপদূতের প্ররোচনায় আমার অমঙ্গলকর ইচ্ছা আমাকে পাপ ও মৃত্যুর হাতে ফেলে দেয়, সেইভাবে আমার ইচ্ছা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রেরণায় মঙ্গলকর ইচ্ছায় পরিণত হয়ে আমাকে নিরপরাধিতায় ও জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য যত অপকর্ম ক্ষেত্রে ঠিক সেইমত হয়। এভাবে এমনটা দেখা যাবে যে, আমাদের বিশ্বাস ও প্রকৃতিগত যুক্তির মধ্যে কোনও বিরোধিতা নেই, ততদূর যতদূর পাপের ক্ষমা অপরিবর্তনীয় কর্মে নয়, বরং মনেই আরোপ করা হয়, সেই যে মনকে অমঙ্গল থেকে মঙ্গলে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

মাংসের পুনরুত্থান

৪১। এই শেষ সূত্র **'মাংসের পুনরুত্থান'** ঘোষণা করায় সংক্ষিপ্ত ক্ষণিকতায় সমস্ত সিদ্ধতার ফলাফল সমাধা করে (ক), যদিও মণ্ডলীর বিশ্বাস এক্ষেত্রেও বিজাতীয়দের দ্বারা শুধু নয়, কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীদেরও দ্বারা আক্রমণের বস্তু হয়। কেননা বালেন্তিনুস মাংসের পুনরুত্থান একেবারে অস্বীকার করে, আর সেইমত মানিপন্থীরাও করে, যেভাবে উপরে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা নবী ইশাইয়ার কথা শুনতে অসম্মত; তিনি তো বলেন, *মৃতেরা পুনরুত্থান করবে, ও যারা কবরে শায়িত তাদের পুনর্জাগরিত করা হবে* (খ), অধিক প্রজ্ঞাবান দানিয়েলের কথাও শুনতে তারা সম্মত নয় যখন তিনি ঘোষণা করেন, *মাটির ধুলায় রয়েছে যারা তারা পুনরুত্থান করবে, এরা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, ওরা লজ্জা ও দুর্নামের উদ্দেশে* (গ)। যে সুসমাচার, দেখা যাচ্ছে, ওরা গ্রহণ করে থাকে, সেই সুসমাচার থেকেও ওদের শেখা উচিত যে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা সাদ্দুকীদের উপদেশ দানকালে বলেছিলেন, *কিন্তু মৃতেরা যে পুনরুত্থান করে, এবিষয়ে ঈশ্বর সেই ঝোপে মোশিকে কেমন কথা বলেছিলেন, তা কি তোমরা পড়নি? তিনি তো বলেছিলেন, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর* (ঘ)। একই প্রসঙ্গে, আগের বচনগুলোতে তিনি স্মরণ করিয়ে

দিয়েছিলেন, পুনরুত্থানের গৌরব কি, ও পুনরুত্থানের গৌরব কেমন মহৎ; তিনি বলেছিলেন, *কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থানে তারা বিবাহও করবে না, তাদের বিবাহও দেওয়া হবে না, বরং হবে ঈশ্বরের দূতদের মত* (ঙ)। তাই পুনরুত্থানের প্রভাব মানুষের উপরে দূততুল্য অবস্থা আরোপ করে, যারা পৃথিবী থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে তারা যেন পৃথিবীতে পশুদের সঙ্গে নয় কিন্তু স্বর্গে দূতদের সঙ্গেই জীবনযাপন করে, যেহেতু তাদের শুচিতর জীবনধারণ তেমন অবস্থার জন্য তাদের উপযোগী করে তুলেছে। এখানে তাদেরই কথা বলা হচ্ছে যারা এমর্তে থেকেও নিজেদের আত্মার মাংসকে কুমারতুল্য ব্যবহারে সংরক্ষিত ক'রে তা পবিত্র আত্মার বাধ্যতায় বশীভূত করেছে। ফলে অপকর্মের যত কালিমা থেকে সেই মাংসকে পরিশুদ্ধ ক'রে ও পবিত্রীকরণের প্রভাবে সেই মাংসকে আত্মিক গৌরবে বদলিয়ে তারা এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যাতে তাদের মাংস দূতদের সাহচর্যে যোগদান করতে পারে।

৪২। কিন্তু অবিশ্বাসী যারা, তারা প্রতিবাদ করে বলে ওঠে, 'যে মাংস পচে গিয়ে বিলীন হয়ে যায় বা ধুলায় পরিণত হয়, এমনকি মাঝে মাঝে সাগরের তলে গ্রাস করা হলে তরঙ্গ দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়, সেই মাংস কেমন করে পুনরায় সংগ্রহ করা যেতে পারবে ও পুনরায় একীভূত করা হবে যাতে তা নিয়ে মানুষের নবীন একটা দেহ গড়া যেতে পারে?' তেমন লোকদের কাছে আমাদের প্রথম উত্তর পলের বাণী দ্বারা উপস্থাপন করি, *নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। আর যা বোন, যে গাছ উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত একটা দানাই মাত্র বুনেছ; আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন* (ক)। যে দানাগুলো তুমি মাটিতে ছড়িয়েছ, সেই দানাগুলোতে প্রতিবছর যে পরিবর্তন ঘটছে বলে তুমি লক্ষ করে থাক, তুমি কি এমনটা বিশ্বাস করতে পার না যে, ঈশ্বরের বিধানক্রমে তোমার যে মাংস মাটিতে বোনা হয়, তোমার সেই মাংসের বেলায়ও সেই পরিবর্তন ঘটবে? বিনয় করি, ঈশ্বরের প্রতাপ সম্পর্কে তোমার এতই নিছক ধারণা কেন যে, প্রতিটি মানুষের মাংস যে ধুলা দিয়ে গড়া, সেই বিক্ষিপ্ত ধুলা যে পুনরায় সংগ্রহ করা হবে ও তার আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে তা তুমি বিশ্বাস করতে পার না? তুমি যখন দেখতে পাচ্ছ সেই মানুষদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি যারা মাটিতে

সমাহিত ধাতুর শিরা খোঁজ করে, অথবা যখন দেখতে পাচ্ছে যে, অনবিজ্ঞ চোখ যেখানে মনে করে সেখানে মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই, বিজ্ঞ চোখ ঠিক সেখানেই সোনা আবিষ্কার করে, তখন তুমি তেমন কিছুও মেনে নিতে রাজী নও? যাকে তিনি গড়েছেন সে যখন তত কিছু করতে পারে, তখন মানুষকে যিনি গড়েছেন, আমরা তাঁকে সেইসব কিছু করার ক্ষমতা আরোপ করব না কেন? আর যখন মানব সূক্ষ্ম বুদ্ধি এমনটা আবিষ্কার করে যে, সোনার স্বীয় শিরা আছে ও রুপোর অন্য একটা, এবং তাও আবিষ্কার করে যে, তামারের অতি আলাদা একটা শিরা এবং লোহা ও সীসার পৃথক পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন শিরা তাতেই নিভৃত অবস্থায় রয়েছে যা দেখতে মাটির মত, তখন প্রতিটি মানুষের মাংসের স্বীয় স্বীয় কণা বিক্ষিপ্ত বলে প্রতীয়মান হলেও তা আকিষ্কার করতে ও বাছাই করতে ঐশপ্রতাপ কি অক্ষম বলে বিবেচিত হবে?

৪৩। তথাপি, এসো, বিশ্বাস-অভাবী সমস্ত আত্মাকে প্রকৃতি থেকে নেওয়া যুক্তির মাধ্যমে সাহায্য করতে চেষ্টা করি। কেউ যদি নানা ধরনের জীব একসাথে মিশিয়ে দিয়ে সেগুলো মাটিতে এলোমেলো ভাবে বুনত, তাহলে সেই নানা জাতের দানা যেইখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো কি নিজ নিজ সময় মত স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে গজিয়ে উঠবে না যাতে করে নিজ নিজ গঠন ও নিজ নিজ দেহের অবস্থা পুনর্গঠন করে?

প্রতিটি মানুষের মাংসের সত্তার বেলায় ঠিক সেইমত ঘটে। যদিও তার কণাগুলো নানাভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তবু যেহেতু সেই সত্তা হলো অমর আত্মারই মাংস, সেজন্য সেই সত্তা নিজেতে অমর আদিকারণের অধিকারী, এবং ঈশ্বর নিজের মঙ্গল-ইচ্ছামত যে সময় নির্ধারণ করবেন, সেসময় সেইগুলো মাটি থেকে সংগ্রহ করা হবে ও সেই আদিকারণে স্বীয় স্বীয় অঙ্গ-কণা আকর্ষণ করা হবে: মৃত্যু আগে তাদের যে গঠন ও আকার বিলীন করেছিল, সেই অঙ্গ-কণাগুলো নিজ নিজ গঠন অনুসারে পুনর্গঠিত হবে। ফলে এমনটা ঘটবে যে, প্রতিটি আত্মাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে, এলোমেলো বা ভিন্ন দেহ অনুসারে নয়, কিন্তু নিজের স্বীয় সেই দেহ অনুসারে যা জীবিত থাকাকালে তার ছিল। এজন্যই মাংসের পক্ষে এটা সম্ভব যে, বর্তমান জীবনের সংগ্রামের প্রতিদান স্বরূপ, অকলুষিত মাংস তার নিজের আত্মার সঙ্গে মুকুটভূষিত হবে, বা কলুষিত মাংস তার নিজের আত্মার সঙ্গে দন্ডিত হবে। সূত্রমালার বিশ্বাস ব্যাখ্যা

করতে গিয়ে আমার [আকুইলেইয়া] মণ্ডলী একথা রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়ে, অন্যান্য মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাস-সূত্রের মত **'মাংসের পুনরুত্থান'** বাক্যটার পরিবর্তে সতর্কতার সঙ্গে **'এই'** শব্দটা যোগ ক'রে **'এই মাংসের পুনরুত্থান'** বচনটা সম্প্রদান করে থাকে। **'এই মাংসের'** বলতে নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে বিশ্বাস-সূত্র উচ্চারণ করতে করতে একথা বলার ক্ষণে কপালে ক্রুশের চিহ্ন করে (ক); তাতে প্রতিটি বিশ্বাসী ব্যক্তি উপলব্ধি করবে, সে নিজের মাংস পাপমুক্ত অবস্থায় রক্ষা করে থাকলে তার মাংস এমন সম্মানের পাত্র হবে যা প্রভুর উপযোগী ও যত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত; কিন্তু তার মাংসটা পাপে কলুষিত হলে তবে সেই মাংস এমন ক্রোধের পাত্র হবে যার ভাবী পরিণাম হবে বিনাশ।

এবার, পুনরুত্থানের গৌরব ও ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত পুরস্কারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে কেউ আরও বেশি কিছু জানতে ইচ্ছা করে, সে প্রায়ই সমস্ত ঐশপুস্তকাদিতেই যথেষ্ট তথ্য পাবে। এক্ষেত্রে আমি সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা উল্লেখ করে বিষয়গুলো এমনি স্মরণ করিয়ে দেব; আর আপনি যে পুস্তিকা লিখতে আমাকে আবদ্ধ করেছেন, এভাবেই আমি সেই পুস্তিকার সমাপ্তি ঘটাব। যেমন, মরণশীল মাংস যে পুনরুত্থান করবে তা ঘোষণা করে প্রেরিতদূত পল এ এ যুক্তি উপস্থাপন করেন, *মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা* (খ)। এবং কয়েকটা পদের পর তিনি বলে চলেন, *আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: আদি সেই খ্রিষ্ট, তারপর, খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি আসবে* (গ)। তারপর তিনি বলে চলেন, *দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা অবশ্যই পুনরুত্থান করব, কিন্তু সকলে যে রূপান্তরিত হব এমন নয় (অথবা, অন্য পাণ্ডলিপিতে যেমনটা পাঠ করি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব বটে, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব এমন নয়), এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন*

মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব (ঘ)। যেটাই হোক শুদ্ধ পাঠ্য, থেসালোনিকীয়দের কাছে পত্রে তিনি লেখেন, *ভাই, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না, যাতে সেই অন্যান্যদেরই মত তোমরা শোকার্ত হয়ে না পড়, যারা আশাবিহীন মানুষ। কেননা আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, যিশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, তবে ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন। কেননা প্রভুর বাণীকে ভিত্তি করে আমরা তোমাদের একথা বলছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত থেকে যাব, নিদ্রাগতদের চেয়ে আমাদের কোন অগ্রাধিকার থাকবে না; কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে আজ্ঞা সহ নেমে আসবেন, এবং খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (ঙ)।

৪৪। তথাপি তোমার এমনটা মনে করা উচিত নয় যে, কেবল পলই কেমন যেন নবীন প্রচারবাণী বলেই একথা চিহ্নিত করেছেন; নবী এজেকিয়েলকে পূর্ব থেকে পবিত্র আত্মার দ্বারা যা বলা হয়েছিল, তাও শোন, 'আমি এখন তোমাদের সামধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের বের করে আনব (ক)। রহস্যময় ভাষায় সমৃদ্ধ সেই যোবের কথাও শোন; তিনি মৃতদের পুনরুত্থান পূর্বঘোষণা করছেন, *গাছের একটা আশা আছে, ছিন্ন হলে তা আবার পল্লবিত হবে, তার কোমল শাখা বাড়তে ক্ষান্ত হবে না। যদিও মাটিগর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়, যদিও ধুলাতে তার গুঁড়ি মারা যায়, তবু জলের গন্ধ পেলে তা আবার পল্লবিত হবে, নতুন গাছের মত তাতে নতুন নতুন শাখা ধরবে। কিন্তু মানুষ মরলে সে কি গত হয়? মরণশীল মানুষ পতিত হলে কি আদৌ আর থাকবে না?* (খ)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? এ কথাগুলোতে তিনি মানুষের লজ্জাবোধকে আহ্বান করছেন, তিনি কেমন যেন বলছেন, 'মানবজাতি কি এতই নির্বোধ যে, যখন তারা দেখে, কাটা গাছের মূল ভূমি থেকে পুনরায় গজিয়ে ওঠে ও মরা কাঠ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা মনে করে, কাঠ বা গাছের অবস্থার সঙ্গে তাদের নিজেদের অবস্থার কোনও

সাদৃশ্য নেই?' তথাপি, 'মরণশীল মানুষ পতিত হলে সে কি আর পুনরুত্থান করবে না?' যোবের একথা যে প্রশ্ন হিসাবেই পাঠ করা উচিত, সেজন্য এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁর পরবর্তী কথা ধর, কেননা তিনি সাথে সাথে বলে চলেন, *কিন্তু মানুষ একবার মরে পুনরুজ্জীবিত হবে* [গ] এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে চলেন, *আমি ততক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকব, যতক্ষণ আমাকে পুনরায় গড়া না হয়* [ঘ]। এবং এরপর তিনি একই কথা পুনরাবৃত্তি করেন, *তিনি পৃথিবীর উপরে আমার এ চর্ম পুনরুত্তোলন করবেন যা এখন যন্ত্রণার এ পাত্র পান করছে* [ঙ]।

৪৫। **'এই মাংসের পুনরুত্থান'**, বিশ্বাস-সূত্রে একথা বলে যা স্বীকার করি, সেসম্পর্কে এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট হোক। সেই **'এই'** শব্দটা বিষয়ে লক্ষ কর, ঐশপুস্তকাদি থেকে আমি যা যা দেখিয়েছি সেই সমস্ত কিছুর সঙ্গে এ শব্দটা কেমন যুক্তিসঙ্গত। 'তিনি পৃথিবীর উপরে আমার এ চর্ম পুনরুত্তোলন করবেন যা এখন সমস্ত যন্ত্রণার এ পাত্র পান করছে' অর্থাৎ, '*আমার চর্ম এসমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করছে*', এই যে পদ আমি উপরে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে যোব আর কী বা ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন? তিনি কি স্পষ্টভাবেই এমনটা বলতে চান না যে, এই মাংসের পুনরুত্থান হবেই? অর্থাৎ, আমি বলতে চাই, এই যে মাংস বর্তমানে অসহ্য পরীক্ষা ও ক্লেশ ভোগ করছে, তিনি কি সেই মাংসের কথা ইঙ্গিত করছেন না? তাছাড়া, প্রেরিতদূত যখন বলেন, *কারণ এই ক্ষয়শীলটাকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীলটাকে অমরতা পরিধান করতে হবে* [ক]। তাঁর এ কথাগুলো কি এমন একজনেরই কথা নয় যে কোনও রকমে নিজের দেহকে স্পর্শ করছে ও তার উপরে আঙুল রাখছে? তাই এই যে দেহ এখন ক্ষয়শীল, পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে সেই দেহ অক্ষয়শীল হবে, এবং এ যে দেহ এখন মরণশীল, সেই দেহ অমরতার গুণাবলিতে পরিবৃত হবে, যাতে, যেমন *খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে এখন তাঁর আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই* [খ], তেমনি যারা খ্রিষ্টে পুনরুত্থান করবে তারা আর কখনও অক্ষয়শীলতা বা মৃত্যু ভোগ করবে না; মাংসের প্রকৃতি যে ছেড়ে দেওয়া হবে এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, মাংসের অবস্থা ও গুণমান বদলি করা হবে। সুতরাং এমন দেহ থাকবে যা মৃতদের মধ্য থেকে অক্ষয়শীল ও অমর হয়ে পুনরুত্থান করবে, ধার্মিকদের শুধু নয়, পাপীদেরও দেহ; ধার্মিকদের দেহ, তারা যেন

খ্রিষ্টের সঙ্গে সবসময়ের মত বাস করতে পারে; পাপীদের দেহ, তারা যেন অনন্তকাল ধরে তাদের প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে পারে।

৪৬। ধার্মিকেরা যে সবসময়ের মত আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে বাস করবে, সেবিষয়ে আমি উপরেই (ক) প্রমাণ দিয়েছিলাম যখন দেখিয়েছিলাম যে প্রেরিতদূত বলেন, *তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (খ)। এবং পবিত্রজনদের মাংস যে পুনরুত্থানের সময়ে এমন গৌরবময় অবস্থায় রূপান্তরিত হবে যার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে ঝুলিয়ে ও বায়ুলোকে ভেসে তাকে কেড়ে নেওয়া হবে, এব্যাপারে বিস্মিত হয়ো না, কেননা, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তিনি তাদের জন্য যে মহা মহা জিনিস মঞ্জুর করেন, সেবিষয় উপস্থাপন করে একই প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (গ)। তবে, পবিত্রজনদের দেহের বিষয়ে যখন বলা হয়, সেগুলোকে বায়ুলোকে কেড়ে নেওয়া হবে, তখন এতে অযৌক্তিক কিছু নেই, যেহেতু সেই দেহগুলোকে খ্রিষ্টের সেই দেহের সমরূপ করা হবে যে দেহ ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন। কিন্তু, হয় নিজের বিষয়ে, না হয় তাঁরই নিজের পদ বা গুণের অধিকারী অন্য একজনের বিষয়ে কথা বলে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি আমাদের খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত করবেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আমাদের আসন দেবেন* (ঘ)। সুতরাং, ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে যেহেতু ঈশ্বরের পবিত্রজনেরা এ অঙ্গীকারগুলোর ও তেমন অগণনই অঙ্গীকারগুলোর অধিকারী, সেজন্য, নবীরা সেবিষয়ে যা যা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তথা, *ধার্মিকেরা পিতার রাজ্যে সূর্যের মত ও গগনতলের উজ্জ্বলতার মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (ঙ), তা বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার হবে না। কেননা যাদের জন্য স্বর্গধামে ঈশ্বরের দূতদের জীবন ও সাহচর্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, বা যাদের বিষয়ে বলা হচ্ছে তাদের খ্রিষ্টের দেহের গৌরবের সমরূপ করা হবে, তারা যে সূর্যের দীপ্তির অধিকারী হবে ও তারকারাজির ও এ গগনতলের উজ্জ্বলতায় ভূষিত হবে, এমন কে যে এমনটা কঠিন মনে করবে? ত্রাণকর্তার মুখে অঙ্গীকৃত সেই গৌরবের বিষয়ে পবিত্র প্রেরিতদূত বলেন, *প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়,*

আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হবে (চ)। কেননা যখন একথা সত্য, এমনকি একথা অবশ্যই সত্য যে, ঈশ্বরের প্রসন্নতা ধার্মিকদের ও পবিত্রজনদের দূতদের সাহচর্যে একত্রিত করবে, তখন এও নিশ্চিত যে, তিনি তাদের দেহকেও আত্মিক দেহের গৌরবে রূপান্তরিত করবেন।

৪৭। তথাপি, এই অঙ্গীকার যেন তোমার কাছে দেহের প্রাকৃতিক গঠনের বিরুদ্ধ মনে না হয়। কেননা, যা যা লেখা রয়েছে, সেই অনুসারে আমরা যদি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর *মাটির ধুলো নিয়ে* (ক) মানুষকে গড়লেন ও আমাদের দেহের প্রকৃতি গড়ার জন্য তাঁর ইচ্ছাক্রমে মাটি মাংসে রূপান্তরিত হল, তবে যেভাবে আমরা বলি, মাটিকে সকল প্রাণিক দেহে উন্নীত করা হয়েছে, সেভাবে প্রাণিক একটা দেহকেও যে আত্মিক একটা দেহে উন্নীত করা হবে, তা যে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত, কেনই বা তোমার কাছে তা অযৌক্তিক ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ মনে হবে?

ধার্মিকদের পুনরুত্থান সম্পর্কে তুমি ঐশশাস্ত্রে এসমস্ত কিছু ও সেইমত আরও অনেক কিছু পাবে। আমি যেমন উপরেও বলেছিলাম, সেই অনুসারে, পুনরুত্থানের সময়ে পাপীদেরও অক্ষয়শীলতা ও অমরতার অবস্থা দেওয়া হবে, যাতে, যেমন ঈশ্বর চিরকালীন গৌরবের খাতিরে ধার্মিকদের উপর এ অবস্থা মঞ্জুর করেন, তেমনি তিনি তাদের লজ্জা ও শাস্তি প্রসারিত করার জন্য পাপীদের উপরেও সেই অবস্থা স্থির করবেন। কেননা, নবীর যে বাণী আমি উপরে উল্লেখ করেছি, সেই বাণী একথাও স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করে, *এবং অনেকেই মাটির ধুলা থেকে পুনরুত্থান করবে: কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কিন্তু কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে* (খ)।

সমাপ্তি ও শেষ প্রার্থনা

৪৮। অতএব, আমরা যদি উপলব্ধি করে থাকি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে কেমন পূজনীয় অর্থে পিতা বলে অভিহিত, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যে কেমন রহস্যময় অর্থে তাঁর একমাত্র পুত্র বলে বিবেচিত, তাঁর আত্মা যে কেমন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধতম অর্থে পবিত্র আত্মা বলে অভিহিত, পবিত্র ত্রিত্ব যে কেমন ভাবে সত্তায় এক আবার কিন্তু সম্পর্ক ও

ব্যক্তি ক্ষেত্রে স্বকীয়তারও অধিকারী [ক], কুমারী থেকে জন্ম যে কী, মাংসে বাণীর জন্ম যে কী, ক্রুশ রহস্য যে কী, পাতালে আমাদের প্রভুর অবরোহণের লক্ষ্য কী, পুনরুত্থানের গৌরব ও পাতালের বন্দিদশা থেকে আত্মাদের মুক্তি যে কী, স্বর্গে তাঁর আরোহণ ও বিচারকর্তার প্রত্যাশিত আগমনও যে কী, তাছাড়া, '*অসারের সভার*' বিপক্ষে পবিত্র মণ্ডলী যে কেমন স্বীকৃতির বস্তু, পবিত্র পুস্তকাদির সংখ্যা কত, ভ্রান্তমতপন্থীদের যে কোন্ কোন্ দল থেকে দূরে থাকা দরকার, পাপের ক্ষমায় ঐশস্বাধীনতা ও মানব যুক্তির মধ্যে যে কোনও বিরোধ নেই [খ], এবং পবিত্র দৈববাণী শুধু নয়, কিন্তু স্বয়ং প্রভু ও ত্রাণকর্তার আদর্শ ও মানব যুক্তির সিদ্ধান্তসমূহও আমাদের মাংসের পুনরুত্থানকে যে সত্য বলে দৃঢ়ীকৃত করে, তবে, আমি আবার বলছি, যদি আমরা এখানে ব্যাখ্যা করা পরম্পরার নিয়ম অনুসারে এসমস্ত কিছু সুবুদ্ধির সঙ্গে পালন করে থাকি, তাহলে আমি প্রার্থনা করি যেন প্রভু আমাদের ও যারা এ সমস্ত কথা শোনে তাদেরও এমনটা মঞ্জুর করেন যাতে, আমরা যে বিশ্বাস গ্রহণ করেছি তা অক্ষুণ্ণ রেখে ও আমাদের দৌড় শেষ ক'রে যেন আমাদের জন্য প্রস্তুত করা সেই ধর্মময়তার মুকুট প্রত্যাশা করতে পারি, যারা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান করবে আমরা যেন তাদেরই মধ্যে পরিগণিত হতে পারি ও লজ্জা ও অনন্ত দুর্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর দ্বারা পবিত্র আত্মার সঙ্গে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরকে গৌরব ও কর্তৃত্ব আরোপিত, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ (ক) এই বিশপ লরেন্স অজানা ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্পর্কে রুফিনুস আর কিছুই বলেন না।

(খ) 'খ্রিষ্টে এখনও শিশু', ১ করি ৩:১; হিব্রু ৫:১২-১৪ দ্রঃ।

এতে রুফিনুস নিজের পুস্তিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, অর্থাৎ তিনি চান বাপ্তিস্ম-প্রার্থীরাই বিশেষভাবে তাঁর ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শিখবে। সেসময় এপ্রথা চলত যে, বাপ্তিস্ম প্রস্তুতিকালের শেষ সপ্তাহের শুরুতে প্রার্থীদের কাছে বিশ্বাস-সূত্র 'সম্প্রদান' করা হত, একই সময় প্রার্থীরা প্রতিদিন সমবেত হয়ে বিশ্বাস-সূত্র সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করত, সেই দিন পর্যন্ত যে-দিনে তারা বিশ্বাস-সূত্রকে 'ফেরৎ' দেওয়ার সাথে সাথে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। এক্ষেত্রে যেরুশালেমের সাধু সিরিলের 'ধর্মশিক্ষা' পাঠ করা যথেষ্ট উপযোগী।

(গ) ফতিনুস আঙ্কিরায় (তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আঙ্কারা) জন্মগ্রহণ ক'রে ৩৪৩ সালে সির্মিউমের বিশপ পদে উন্নীত হয়, কিন্তু তার ধর্মশিক্ষা ৩৪৪ সালে আন্তিওখিয়া ধর্মসভায় ভ্রান্তমত বলে চিহ্নিত ও দণ্ডিত হয়।

(ঘ) ইশা ১০:২২-২৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য। রুফিনুসের ব্যাখ্যা অনুসারে, এই ভাববাণীতে উল্লিখিত 'সংক্ষিপ্ত বচন'টা মণ্ডলীর বিশ্বাস-সূত্রে সিদ্ধি লাভ করে যা মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বসমূহ সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করে।

২ (ক) প্রেরিতদূতেরা নিজেরাই যে বিশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন করেছিলেন, এ কাল্পনিক কাহিনী যে কবে বা কোথা থেকে উদ্ভূত হয়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা স্বীকৃত যে, প্রথম বিশ্বাস-সূত্রগুলো ২য় শতাব্দীতে নানা মণ্ডলীতে সঙ্কলিত হতে শুরু করে।

(খ) প্রেরিতদূতেরাই যে বিশ্বাস-সূত্রকে সিম্বলুম' (লাতিন) নাম দিতে ইচ্ছা করেছিলেন, একথাও কাল্পনিক যেহেতু, যেমনটা বলা হয়েছে, বিশ্বাস-সূত্রগুলো ২য় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়। তাছাড়া, σύμβολον (সিম্বলোন') গ্রীক শব্দটা যে এমন সংযোজন কর্ম বোঝায় যাতে নানা ব্যক্তি নিজ নিজ অবদান রাখে, একথাও সঠিক নয়, কেননা সংযোজন কর্ম বোঝাবার জন্য 'সিম্বলে' শব্দটা ব্যবহৃত। কিন্তু তবুও, 'সিম্বলোন' বা 'সিম্বলুম' এর অর্থ যে প্রতীকচিহ্ন ও পরিচয়-চিহ্ন, এ কথা বলায় রুফিনুস ঠিকই কথা বলছেন।
ঐতিহাসিক দিক দিয়ে একথা স্মরণযোগ্য যে, প্রাচীনকালে, অর্থাৎ রুফিনুসের আগেও, 'সিম্বলোন' বা 'সিম্বলুম' শব্দটা বিশ্বাস-সূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণা ছিল না, পক্ষান্তরে শব্দটা সেই তিনটে প্রশ্নোত্তর ও তিনটে অবগাহনকেই বোঝাত যা বাপ্তিস্ম সম্পাদনকালে অনুষ্ঠিত হত। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান ছিল এরূপ: বাপ্তিস্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি প্রথম প্রশ্ন উচ্চারণ করত, তাতে প্রার্থী উত্তর দিয়ে জলে ডুব দিত; তারপর সম্পাদনকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করত, তাতে প্রার্থী উত্তর দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত জলে ডুব দিত; অবেশেষে সম্পাদনকারী ব্যক্তি তৃতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করত, তাতে প্রার্থী উত্তর দিয়ে তৃতীয় বারের মত জলে ডুব দিত। ঠিক এ অনুষ্ঠানকেই 'সিম্বলোন' বা 'সিম্বলুম' বলা হত।

'ত্রিত্ব' সম্পর্কিত সেই তিনটে প্রশ্ন 'মোটামুটি' এরূপ ছিল (অর্থাৎ প্রশ্নত্রয় হয় তো দীর্ঘতরও হতে পারত):

১ম প্রশ্ন: তুমি কী পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?
উত্তর: হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।
(প্রার্থী প্রথম বারের মত ডুব দিত)

২য় প্রশ্ন: তুমি কি তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস কর?
উত্তর: হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।
(প্রার্থী দ্বিতীয় বারের মত ডুব দিত)

৩য় প্রশ্ন: তুমি কি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর?

উত্তর : হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।
(প্রার্থী তৃতীয় বারের মত ডুব দিত)

অতএব, সেই তিনটে প্রশ্ন, সেই তিনটে উত্তর ও সেই তিনটে অবগাহন প্রার্থীর ত্রিত্ব-বিশ্বাসকে 'চিহ্নিত' করত, অর্থাৎ এসকিছু একসাথেই 'সিম্বলোন' বা 'সিম্বলুম', বা 'প্রতীক-চিহ্ন' বা 'পরিচয়-চিহ্ন' বলে পরিগণিত ছিল।
কেবল পরবর্তীকালেই, 'সিম্বলোন', 'সিম্বলুম', 'প্রতীক-চিহ্ন' ও 'পরিচয়-চিহ্ন' শব্দগুলো সেই সূত্রমালাতেই আরোপ করা হলো যে সূত্রমালা ইতিমধ্যে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল ও যা আজকালে আমরা 'বিশ্বাস-সূত্র' বলে থাকি।

(গ) রো ১৬:১৮ ও প্রেরিত ১৯:১৩ দ্রঃ।

(ঘ) যেরুশালেমের সাধু সিরিলও নিজের 'ধর্মশিক্ষায়' এবিষয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন যাতে প্রার্থীরা সূত্রগুলো কাগজে না লিখে নিজেদের হৃদয়-ফলকেই তা খোদাই করে (ধর্মশিক্ষা ৫:১২; ৬:২৯)। প্রকৃতপক্ষে সূত্রটা, প্রভুর প্রার্থনা ও সাক্রামেন্তসমূহ যে একেবারে গোপন রাখা উচিত, তা সেকালের সকল বিশপগণ সমর্থন করতেন।

(ঙ) আদি ১১:১-৯ দ্রঃ। 'জীবন্ত পাথর', ১ পি ২:৪ ··· দ্রঃ।

৩ (ক) রুফিনুসের ধারণায় রোমের বিশ্বাস-সূত্রই প্রকৃত সূত্র, কেননা সেই সূত্র প্রেরিতদের অধিকারে চিহ্নিত ও সমস্ত ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত। অন্যদিকে, তিনি আকুইলেইয়াতে জন্ম নিয়েছিলেন, প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় আকুইলেইয়ার প্রতি তাঁর এই ভক্তি-অনুরাগের ফলেই তিনি বিশ্বাস-সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকুইলেইয়ার বিশ্বাস-সূত্রকেই ভিত্তি করে ব্যাখ্যাটা উপস্থাপন করেন। এজন্য তিনি আকুইলেইয়ার বিশ্বাস-সূত্রের প্রতিটি বচন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সবসময়ই রোমের বিশ্বাস-সূত্রের বচনও উপস্থাপন করেন।

(খ) যে অনুষ্ঠানের কথা রুফিনুস ইঙ্গিত করছেন, সেটা হলো 'বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ' বলে অভিহিত সেই অনুষ্ঠান যা বাপ্তিস্ম-প্রার্থীদের প্রস্তুতিকালের সমাপ্তি চিহ্নিত করে প্রকৃত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান শুরু করে দিত (উপরে ১খ টীকা দ্রঃ)। অনুষ্ঠানটা যে রোমে অধিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হত, সেবিষয়ে সাধু আগস্তিনও সমর্থন করেন (স্বীকারোক্তি ৮:২,৫)।

(গ) সাধু বাসিল, সাধু আগস্তিন, নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি, সাধু জন খ্রিসোস্তম ইত্যাদি বহু ব্যক্তিত্বের মত রুফিনুসও শিশুকালে নয়, যৌবনকালেই (৩৬৯ বা ৩৮০ সালে) বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন; তখন তাঁর বয়স ছিল ২৪ বা ২৫।

(ঘ) হিব্রু ১১:৬। লক্ষণীয় বিষয়, বচনটা প্রকৃতপক্ষে এরূপ : 'ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।'

(ঙ) ইশা ৭:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(চ) বিশ্বাস যে শুধু ধর্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং প্রকৃত হতে হলে বিশ্বাসকে জীবনের সব ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করতে হবে; সেকালের খ্রিষ্টিয়ান তর্কবিদগণ বিধর্মীদের সঙ্গে তর্কযুক্তি করতে গিয়ে ঠিক এবিষয়ের উপরেই জোর দিতেন।

৪ (ক) পাঠক / পাঠিকা 'বিশ্বাস-সূত্রের নানা পাঠ্য' অধ্যায়ে (উপরে, ভূমিকা দ্রঃ) রুফিনুসের এ মন্তব্য সত্য বলে পরীক্ষা করতে পারেন, তথা: প্রাচ্য (গ্রীক) মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাস-সূত্র **'এক'** শব্দটার উপরে জোর দেয়, এবং রোম বিশ্বাস-সূত্রের তুলনায় সেই **'এক'** শব্দটা তাদের বিশ্বাস-সূত্রকে বিশিষ্ট এক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে। যেমন,

রোম: …সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে [আমি বিশ্বাস করি]।
প্রাচ্য: আমরা **এক-ঈশ্বরে,** …সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বার করি।

রোম: … আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে আমি বিশ্বাস করি।
প্রাচ্য: আমরা **এক-প্রভুতে,** … সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি।

রোম: আমি পবিত্র আত্মায়, [বিশ্বাস করি]।
প্রাচ্য: আমরা … **এক-পবিত্র আত্মায়** বিশ্বাস করি।

এব্যাপারে রুফিনুস ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সম্ভবত সেই প্রাচ্য (গ্রীক) মণ্ডলীগুলো 'আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, …মাত্র এক প্রভু আছেন' প্রেরিতদূত পলের একথা দ্বারা (১ করি ৮:৬) অনুপ্রাণিত হয়েই তা করছিলেন।

(খ) ১ করি ৮:৬।

(গ) ঐশপ্রজনন সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় রুফিনুস যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ব্যাখ্যার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করেন (ধর্মশিক্ষা ১১:১১-১৩), ও তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, ঐশপ্রজনন রহস্যটা এমন মানব ধারণার অতীত রহস্য যা বিষয়ে বেশি তর্কযুক্তি করলে ভ্রান্তমতের উদ্ভব হয়, যেইভাবে ঘটেছিল আরিউসের বেলায়।

(ঘ) মথি ১৭:৫।

(ঙ) যোহন ১৪:৯, ১০:৩০; ১৬:২৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৫ (ক) কল ১:১৬। লক্ষণীয় বিষয়, 'সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে' এর পরিবর্তে রুফিনুস বলেন, 'সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে'।

(খ) হিব্রু ১:২। বচনটা যেভাবে উল্লিখিত, সেভাবে সঠিক নয়; বাইবেলের বচনটা প্রকৃতপক্ষে হলো, 'তাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও তাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন।'

(গ) প্রকাশ ৪:৮ দ্রঃ। প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের সঠিক বচনটা হলো, 'তাঁরা দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!'

(ঘ) ‘পাতৃপাসিও’ মতপন্থীরা এমন ভ্রান্তমত সমর্থন করত যার ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার পার্থক্য বিলীন হয়ে যেত। তাদের মতে, খ্রিষ্ট যিশুতে যিনি জন্ম নিয়েছিলেন, ও যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ঈশ্বরের সেই পুত্র ও পিতা একই।

(ঙ) বারুক ৩:৩৬-৩৮। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বারুক ৩:৩৮ প্রকৃতপক্ষে বলে, ‘এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হল, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাল’, অর্থাৎ প্রজ্ঞাই দৃশ্যমান হল ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাল; কিন্তু সেকালের অন্যান্য ব্যাখ্যাতাদের সঙ্গে রুফিনুসও অনুবাদ করে লিখলেন, ‘তিনি [অর্থাৎ মশীহ] দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।’ এর কারণ হলো, যেহেতু খ্রিষ্টিয়ান মতে প্রজ্ঞা ছিলেন ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, আর সেই ব্যক্তির অন্য নাম হলো ‘মশীহ’, সেজন্য রুফিনুস নিজের অনুবাদে সরাসরি বলেন, ‘তিনি দৃশ্যমান হলেন’, ইত্যাদি।

৬ (ক) লাতিন পাঠ্য অনুসারে গণনা ১৩:১৬ হলো, ‘মোশি নূনের সন্তান হোশেয়ার নাম যিশু রাখলেন।’

(খ) যাজকদের তৈলাভিষেক সম্পর্কে যাত্রা ৩০:২৫-৩২; লেবীয় ৮:১২ ইত্যাদি দ্রঃ। রাজাদের তৈলাভিষেক সম্পর্কে ১ রাজা ৯:১৬; ১০:১; ১৫:১ ইত্যাদি দ্রঃ।
রুফিনুসের মত যেরুশালেমের সাধু সিরিলও যিশুর খ্রিষ্ট-ভূমিকাকে তাঁর যাজকত্বের সঙ্গে যুক্ত করেন (ধর্মশিক্ষা ১০:৪, ১১, ১৪)। তবু সাধারণ মতে, যিশু খ্রিষ্ট-ভূমিকাটা বাপ্তিস্মের সময়েই গ্রহণ করেছিলেন যখন পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে নেমে এসেছিলেন (মথি ৩:১৬ দ্রঃ)।

(গ) প্রেরিত ১০:৩৮। রুফিনুস এ বচনে ‘স্বর্গ থেকে প্রেরিত’ [আত্মাকে] বাক্যটা যোগ করেন।

(ঘ) ইশা ৬১:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) রুফিনুসের এই ব্যাখ্যা হিব্রু ৫:৬ ধ্বনিত করে।

(চ) মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ার সেই আরিউস ও তার ভ্রান্তমতপন্থীরা মানব-প্রজননের সঙ্গে তুলনা করে বলত, খ্রিষ্ট যদি সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাকতেন, তাহলে এর ফলে ঐশসত্তা (অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব) অবশ্যই দু' ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এতে প্রতিবাদ করে খ্রিষ্টমণ্ডলী নিকেয়ায় অনুষ্ঠিত মহাসভায় (৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে) বলেছিল, ঐশসত্তাটা জড় পদার্থ নয়, তা বরং আত্মিকই এক সত্তা, ফলে আরিউসপন্থীদের উপস্থাপিত তুলনা দাঁড়ায় না। এবিষয়ে সাধু আথানাসিউসই বিশেষভাবে রহস্যটা ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন, যেহেতু ঈশ্বরত্ব আত্মিক ও একক, ও যেহেতু যা একক তা বিভক্ত করা যায় না, সেজন্য পিতা পুত্রকে জনিত করলেও সেই এককত্ব বিভক্ত না হয়ে বরং একক হয়ে থাকে। যেরুশালেমের সাধু সিরিলও একই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন (ধর্মশিক্ষা ৭:৫)।

(ছ) রো ১৬:২৭।

(জ) ১ করি ১:২৪।

(ঝ) ১ করি ১১:৩।

৭ (ক) যেরুশালেমের সাধু সিরিলও একই যুক্তি উপস্থাপন করেন, ধর্মশিক্ষা ১১:৭-১০। সাধু আম্ব্রোজ ও সাধু আথানাসিউসও একই ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতেন (টীকা নং ৬চ দ্রঃ)।

(খ) মথি ১৩:৩৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) মথি ১৩:৪৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৮ (ক) 'একমাত্র' (μονογενὴς)শব্দটা নূতন নিয়মে একক অর্থ বহন করলেও তবু বিশিষ্ট দু'টো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত: (১), সাধারণ অর্থ অনুসারে, যেমন 'একমাত্র ছেলে' (লুক ৭:১২; ৮:৪২; ৯:৩৮; হিব্রু ১১:১৭); কিন্তু (২), যখন শব্দটা ঈশ্বরের পুত্র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, তখন যোহনের সুসমাচারে ও ১ম পত্রে 'একমাত্র জনিত' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত (যোহন ১:১৪, ১৮; ৩:১৬, ১৮; ১ যোহন ৪:৯); এতে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে পুত্রের স্বকীয় ও অনন্য সম্পর্ক আলোকিত যার ফলে পিতার সঙ্গে পুত্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য, ও কেবলমাত্র পুত্রই যে পিতাকে অনন্যভাবে জানেন তাও প্রকাশিত। বিশ্বাস সূত্রে প্রাচ্য (গ্রীক) মণ্ডলীগুলোই বিশেষভাবে এ সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে:

রোম: …এবং তাঁর **একমাত্র** পুত্র … সেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমি বিশ্বাস করি।
প্রাচ্য: …আমরা …ঈশ্বরের **একমাত্র জনিত** পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি।

(খ) এপ্রসঙ্গে যেরুশালেমের সাধু সিরিল বলেন, 'পুত্র' শব্দটা শুনে তুমি এমন পুত্রের কথা ভাববে না যিনি দত্তক গুণে গৃহীত পুত্র, কিন্তু স্বরূপ গুণেই হওয়া পুত্রেরই কথা ভাববে, অর্থাৎ একমাত্র জনিতই এমন পুত্র যাঁর কোন ভাই নেই' (ধর্মশিক্ষা ১১:২)। তিনি আরো বলেন, 'পিতা থেকে জনিত হওয়ায় তিনি দত্তক ভিত্তিতে নয়, স্বরূপেই ঈশ্বরের পুত্র' (ধর্মশিক্ষা ১১:৭)।

(গ) ১ করি ৮:৬।

৯ (ক) মথি ১:২৩।

(খ) এজে ৪৪:২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য। নবী এজেকিয়েল প্রকৃতপক্ষে যেরুশালেমের পুনর্নির্মিত মন্দিরেরই কথা বলছেন যা তিনি দর্শনে দেখেছিলেন; সেই অনুসারে, মন্দিরের পূবদ্বার তখনই বন্ধ করা হবে যখন প্রভুর গৌরব মন্দিরে প্রবেশ করবে। কিন্তু খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেকালের লেখকগণের সঙ্গে রুফিনুসও তুলনামূলক ব্যাখ্যা অনুসরণ করে বলেন, সেই বন্ধ করা দ্বার আধ্যাত্মিক অর্থে পবিত্রা মারীয়ার কুমারীত্বকেই লক্ষ করে।

(গ) এখানেও, ৪র্থ শতাব্দীর অন্যান্য লেখকগণের সঙ্গে রুফিনুসও পবিত্র মারীয়ার নিত্য কুমারীত্ব সমর্থন করেন যা অনুসারে ধন্যা কুমারী মারীয়া প্রসবের আগে ও প্রসবের পরেও নিত্য কুমারী হয়ে থাকলেন। ধারণাটা মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে সর্বত্রই যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, কিন্তু রুফিনুসের সময়ে (৪র্থ শতাব্দীতে) এমন ভ্রান্তমত দেখা দিয়েছিল যা অনুসারে,

প্রভু যিশুকে প্রসব করার পরে ধন্যা মারীয়া যোসেফের দ্বারা অন্য ছেলেমেয়েকে প্রসব করেছিলেন। সেজন্য, ধন্যা মারীয়া যে প্রসবের আগে ও প্রসবের পরে চিরকাল ধরেই কুমারী হয়ে থাকলেন, মিলান-সভা (৩৯০ সালে) একথা অবশ্য বিশ্বাস্য তত্ত্ব বলে স্থির করল।

১০ (ক) লুক ১:৩১। সম্ভবত রুফিনুস একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, কেননা বচনটা প্রকৃতপক্ষে মথি ১:২১ লক্ষ করে।

(খ) লুক ১:৩৪-৩৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

১১ (ক) ফৈনিক্স পাখির কথা সেকালে খ্রিষ্টিয়ান ও বিধর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সেবিষয়ে রোমের সাধু ক্লেমেন্ট (প্রেরিতিক পিতৃগণ, করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেন্টের পত্র, ৩৫) ও যেরুশালেমের সাধু সিরিল (ধর্মশিক্ষা ১৮:৮) যথেষ্ট তথ্য উপস্থাপন করেন।

(খ) এ ভুল ধারণাও প্রচীনকালে যথেষ্ট সমর্থন লাভ করত।

(গ) মিনের্ভা ও যুপিতের উভয়ই ছিল রোম পুরাণের দেব-দেবী: মিনের্ভা ছিল হস্তশীল্পের প্রতিপালিকা দেবী, ও যুপিতের ছিল প্রধান দেবতা।

(ঘ) রোম পুরাণে বাক্কুস ছিল উর্বরতা (বিশেষভাবে আঙুরফল) এর প্রতিপালক দেবতা।

(ঙ) গ্রীক পুরাণে আফ্রদিতেস ছিল ভালবাসার প্রতিপালিকা দেবী। রোম পুরাণে তার নাম ছিল ভেনুস। আফ্রদিতেস নামটার অর্থই সম্ভবত সমুদ্রের 'ফেনা' শব্দ থেকে উদ্গত।

(চ) কাস্তর ও পল্লুক্সও ছিল গ্রীক পুরাণের দেব বিশেষ, যারা জেউস ও লেদার যমজ সন্তান ও হেলেনের ভাই।

(ছ) গ্রীক পুরাণে, মির্মিদোনেরা ছিল থেসালিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা, যেখানে (পুরাণের কথা অনুসারে) জেউস পিঁপড়াগুলোকে মানুষে পরিণত করেছিল। মির্মিদোন নামটা গ্রীক 'মির্মিকে' শব্দ থেকে উদ্গত যার অর্থ 'পিঁপড়া'।

(জ) গ্রীক পুরাণ অনুসারে, যখন জেউস এককালের মানুষের পাপকর্মের শাস্তি দেবার জন্য পৃথিবীকে জলপ্লাবনে প্লাবিত করেছিল, তখন দেউকালিওন ও তার স্ত্রী পির্‌হা একটা জাহাজ তৈরি করে প্লাবন শেষ না হওযা পর্যন্ত জলের উপরে ভেসে থেকেছিল। তারপর এক দেব তাদের এ পরামর্শ দিয়েছিল যেন তারা নিজেদের মাতাপিতার হাড় নিজেদের কাঁধের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে। তারা তো ঠিকই বুঝেছিল যে, হাড়গুলো বলতে পৃথিবীর পাথর বোঝায়; তাই দেউকালিওনের ছোঁড়া পাথরগুলো থেকে পুরুষ, ও পির্‌হার ছোঁড়া পাথরগুলো থেকে স্ত্রীলোক উদ্ভূত হেয়ছিল। গল্পটা যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষায়ও উল্লিখিত (ধর্মশিক্ষা ১২:২৭)।

১৪ (ক) লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, রোমের প্রাচীন বিশ্বাস-সূত্রে 'পাতালে অবরোহণ করলেন' বচনটা নেই (ভূমিকা দ্রঃ)।

(খ) এফে ১:১৮; ৩:১৮।

(গ) ফিলি ২:১০।

(ঘ) ইশা ৬৫:২।

১৫ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(খ) ‘জগতের অধিপতি’, যোহন ১২:৩১, ১৪, ৩০; ১৬:১১ দ্রঃ।

(গ) ইশা ৫০:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) কল ২:১৪-১৫। বচনটা অপূর্ণাঙ্গ।

(ঙ) এজে ৩০:৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(চ) লুক ১০:১৯।

(ছ) ফিলি ২:৫-৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

১৬ (ক) ফিলি ২:৭।

(খ) খ্রিষ্টমণ্ডলীর ২য় শতাব্দীর প্রখ্যাত লেখক অরিগেনেস খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্ম সম্পর্কে এমন ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন যা অনুসারে, পাপের বন্ধন থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য খ্রিষ্ট শয়তানের কাছে মুক্তিমূল্য হিসাবে নিজেকে অর্পণ করেছিলেন, এবং তেমন আদান-প্রদানে আকর্ষিত হওয়ার পর শয়তান দেখল, সে খ্রিষ্টের পাপবিহীন আত্মাকে ধরে রাখতে পারছিল না। অরিগেনেসের এধারণা সেকালে খুবই প্রচলিত ছিল, এমনকি নানা লেখকগণ ধারণাটা আরো অলঙ্কৃত করে বলছিলেন, সেই আদান-প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল শয়তানকে প্রবঞ্চিত করা। বড়শি উদাহরণের মধ্য দিয়ে রুফিনুস ঠিক এ অলঙ্কৃত ধারণাই অনুসরণ করছেন, অর্থাৎ লোভী শয়তান টোপটা দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে বড়শি গ্রাস করে তাতে নিজেই আটকিয়ে পড়েছিল।

(গ) যাত্রা ১২:৭। প্রথম পাস্কা-রাতে ইস্রায়েলীয়রা নিজেদের বাড়ির দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে যে মেষশাবকের রক্ত লেপে দিয়েছিল, সেই মেষশাবক ছিল সেই প্রভু যিশুর একটা পূর্বচিহ্ন যিনি নিজের রক্ত দিয়ে মানবমুক্তি সাধন করেছেন। এধারণাও সেকালে খুবই প্রচলিত ছিল।

(ঘ) এজে ৩২:৩...।

(ঙ) সাম ৭৪:১৪।

(চ) যোব ৪০:২৫।

১৭ (ক) সাম ১০৭:১০ দ্রঃ।

১৮ (ক) পন্তিয় পিলাত সংক্রান্ত এবচন সাধু পলের উক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে (১ তি ৬:১৩ দ্রঃ)। প্রথম শতাব্দীগুলোর লেখকগণও বাক্যটা খুবই ব্যবহার করতেন (প্রেরিতিক পিতৃগণ, সাধু ইগ্নাসিউস, মাগ্নেশীয়দের কাছে পত্র ১১:১; ত্রাল্লীয়দের কাছে পত্র ৯:১; স্মির্নীয়দের কাছে পত্র ১:২)। মণ্ডলীর বিশ্বাস-সূত্র সম্ভবত পন্তিয় পিলাতের কথা এই উদ্দেশ্যই উল্লেখ করে, যাতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রভুর মুক্তিকর্ম পৌরাণিক রূপকথা নয়, ঐতিহাসিক ও বাস্তবই একটা ঘটনা।

(খ) পাতালে প্রভু অবরোহণের কথা কেবল ৩৫৯ খ্রিষ্টাব্দে, নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভার সময়েই, মণ্ডলীর বিশ্বাস-সূত্রগুলোতে স্থায়ীভাবে স্থান পেতে লাগল; বাস্তবিকই, এপুস্তকের ভূমিকায়ও প্রমাণিত হয় যে, রোমের প্রাচীন বিশ্বাস-সূত্রে ও প্রাচ্য বিশ্বাস-সূত্রেও পাতালে অবরোহণের কথা উল্লিখিত নয়।

১৯ (ক) ১ করি ১:২৩-২৪।

(খ) ১ করি ১:১৮।

(গ) ইশা ৫২:১৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য; বচনটা রো ১৫:২১-এও উল্লিখিত, যেখানে সাধু পলও বলেন যে, একদিন বিজাতীয়রাও খ্রিষ্টকে গ্রহণ করবে।

(ঘ) ইশা ২৫:৬…, প্রাচীন লাতিন পাঠ্য। যেরুশালেমের সাধু সিরিল নবী ইশাইয়ার ভাববাণীকে এউখারিস্তীয় অর্থ আরোপ করেন (ধর্মশিক্ষা ২১:৭)।

(ঙ) বিলাপ ৪:২০। যুস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; , প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ৭১; যেরুশালেমের সিরিল, ধর্মশিক্ষা ১৩:৭; ১৭:৩৫; আম্ব্রোজ, রহস্যগুলি প্রসঙ্গ ৫৮ (এসমস্ত লেখা এখানে পাওয়া যায়)।

২০ (ক) এই ২০ অধ্যায় থেকে ৩০ অধ্যায় পর্যন্ত রুফিনুস একপ্রকারে অক্ষরে অক্ষরে যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা (১৩:৮-৩৫) অনুবাদ করে উপস্থাপন করেন।

(খ) সাম ৪১:১০।

(গ) সাম ৩৮:১২।

(ঘ) সাম ৫৫:২২।

(ঙ) মথি ২৬:৪৯। রুফিনুসের উল্লিখিত বচন বাইবেলের প্রকৃত বচন অনুযায়ী নয়।

(চ) লুক ২২:৪৮।

(ছ) জাখা ১১:১২-১৩।

(জ) মথি ২৭:৩…।

(ঝ) ইশা ৩:৯; প্রজ্ঞা ২:১২।

২১ (ক) ইশা ৩:১৪।

(খ) ইশা ৫৩:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) ইশা ৫০:৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য। মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে, এবচনে নবীর মুখ দিয়ে ত্রিত্বের স্বয়ং দ্বিতীয় ব্যক্তিই কথা বলছেন।

(ঘ) হো ১০:৬। যেমন একসময় আশুর-রাজ যারিমের কাছে বাঁধা অবস্থায় উপঢৌকন পাঠানো হয়েছিল, তেমনি পিলাত হেরোদ রাজাকে খুশী করার জন্য তাঁর কাছে শেকলে আবদ্ধ যিশুকে পাঠিয়েছিলেন। এই ভিত্তিতে রুফিনুস যারিমকে হেরোদের পূর্বচ্ছবি বলে পরিগণিত করেন।

(ঙ) লুক ২৩:৬-৯। বচনটা বাইবেল অনুযায়ী উল্লিখিত নয়।

(চ) 'বন্য আঙুরলতা'। হেরোদ ইহুদী ছিলেন না, বরং এদোমীয় হওয়ায় তিনি ছিলেন ইহুদীদের ঘৃণার পাত্র।

(ছ) ইশা ৫:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(জ) যোব ১২:২৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

২২ (ক) লুক ২৩:২১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(খ) যেরে ১২:৮,৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) ইশা ৫৭:৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) মথি ২৬:৬৩ দ্রঃ।

(ঙ) সাম ৩৮:১৫, ১৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(জ) ইশা ৫৩:৭-৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঝ) পরমগীত ৩:১১। রুফিনুস বচনটাকে সূক্ষ্ম ভাবে অনুবাদ করছেন না।

(ঞ) ইশা ৫:২, ৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ট) আদি ৩:১৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঠ) যেরে ১১:১৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ড) দ্বিঃবিঃ ২৮:৬৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

২৩ (ক) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।

(খ) যোহন ৭:৩৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) মথি ২৭:২৫ দ্রঃ।

(ঘ) মন্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলো থেকে এধারণা প্রচলিত হতে লাগল যে, ‘যেহেতু সুসমাচারে পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মের প্রতাপ দ্বিবিধ তথা, একটা প্রতাপ যা জল দ্বারা আলোপ্রত্যাশীদের মঞ্জুর করা, ও দ্বিতীয় প্রতাপ যা নির্যাতনকালে রক্তদানের মাধ্যমে পবিত্র সাক্ষ্যমরদের মঞ্জুর করা, সেজন্য সেই পরিত্রাণদায়ী পাশ থেকে রক্ত ও জল নির্গত হয়েছিল’ (যেরুশালেমের সাধু সিরিল, ধর্মশিক্ষা ১৩:২১)।

(ঙ) এবিষয়ে যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা এ, ‘সেই পাশ উল্লেখ করার আর একটা কারণ রয়েছে, অর্থাৎ, পাপের আদি সম্পাদনকারিণী ও পরিচালিকা হয়েছিলেন এমন এক নারী যাঁকে একটা পাশ থেকে গড়া হয়েছিল, কিন্তু পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্ষমার অনুগ্রহ বর্ষণ করতে এসেছেন যিনি, সেই যিশু সেই পাপ মোচন করার লক্ষ্যে নারীদেরই জন্য পাশে বিদ্ধ হয়েছিলেন’ (ধর্মশিক্ষা ১৩:২১)।

২৪ (ক) মথি ২৭:৪৫ দ্রঃ।

(খ) আমোস ৮:৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) জাখা ১৪:৬-৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) যোহন ১৮:১৮; মার্ক ১৪:৬৭ দ্রঃ।

(ঙ) জাখা ১৪:৬।

(চ) আমোস ৮:৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

২৫ (ক) মথি ২৭:৩৫ দ্রঃ।

(খ) সাম ২২:১৯; মার্ক ২৭:১৫।

(গ) ইশা ৬৩:১-৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) রো ৫:১২ ··· দ্রঃ।

২৬ (ক) সাম ৬৯:২২।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) পরমগীত ৫:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

২৭ (ক) মথি ৫৭:৫০ দ্রঃ।

(খ) সাম ৩১:৬।

(গ) বিলাপ ৩:৫৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) ইশা ৫৭:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) ইশা ৫৩:৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(চ) আদি ৪৯:৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

২৮ (ক) সাম ২২:১৬।

(খ) সাম ৩০:১০।

(গ) সাম ৬৯:৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) লুক ৭:২০।

(ঙ) ১ পি ৩:১৮-২০। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উদ্ধৃত নয়।

(চ) সাম ১৬:১০।

(ছ) সাম ৩০:৪।

২৯ (ক) সাম ১৬:১০।

(খ) রুফিনুস সেকালের লেখকদের মত মনে করছিলেন, পুরাতন নিয়মের যে কুলপতিরা, নবীরা ও ধার্মিক সকল মানুষ পাতালে অবস্থান করছিলেন, পাতালে গিয়ে খ্রিষ্ট তাঁদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বিষয়টা যেরুশালেমের সাধু সিরিল এভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'তিনি পাতালে একাই অবরোহণ করেছিলেন কিন্তু সেখান থেকে বহুসংখ্যক সঙ্গীদের সঙ্গে করে আরোহণ করেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি মৃত্যুতে অবরোহণ করলেন ও '*অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ* তাঁর দ্বারা *পুনরুত্থিত হল*'। পাতালের শেকলে আবদ্ধ না হয়ে এমন নতুন একজনকে পাতালে নেমে যেতে লক্ষ করে মৃত্যু আতঙ্কিত হল। (…) মৃত্যু পালিয়ে গেছিল, ও তার সেই পলায়ন তার কাপুরুষত্ব প্রকাশ করল। পবিত্র নবীরা তাঁর দিকে ছুটে গেলেন, ও বিধানদাতা সেই মোশি, সেই আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোব, সেই দাউদও ও শামুয়েল, ইশাইয়া ও বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহনও ছুটে গেলেন যিনি তখনই সাক্ষ্যদান করেছিলেন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, *যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?* মৃত্যু যাঁদের কবলিত করেছিল, সেই ধার্মিকেরা সবাই মুক্তি পেলেন, কেননা যাঁকে তাঁরা রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই তিনি যে আপন উৎকৃষ্ট অগ্রদূতদের মুক্তিসাধক হয়ে উঠবেন তা অধিক সমীচীন' (ধর্মশিক্ষা ১৪:১৮-১৯ দ্রঃ)।

(গ) যোহন ১২:৩২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) মথি ২৭:৫২। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

(ঙ) গা ৪:২৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(চ) হিব্রু ২:১০।

(ছ) এফে ২:৬।

(জ) যেরে ১৮:৪। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

৩০ (ক) সাম ৩:৬।

(খ) সাম ১২:৬।

(গ) সাম ৩০:৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) সাম ৭১:২০।

(ঙ) সাম ৮৮:৫।

(চ) হো ৬:৩।

(ছ) ইশা ৬৩:১১।

(জ) ইশা ২৭:১১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঝ) যোহন ২০:১৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঞ) পরমগীত ৩:১।

(ট) পরমগীত ৩:৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৩১ (ক) এখানে রুফিনুস সেই গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে চিহ্নিত করতে অভিপ্রেত যা কালক্রমে 'দ্বৈতস্বরূপ' তত্ত্ব বলে পরিচিত হবে। অর্থাৎ, স্বর্গারোহণ, আসনগ্রহণ ও পুনরাগমন রহস্যত্রয় সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য তত্ত্বটা অপরিহার্য। কেননা, ঈশ্বরের পুত্র যে নিজের ঐশস্বরূপ গুণে অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে পিতাতে বিরাজিত, একথা যদি ভুলে যাই, তাহলে আমরা সেই ভ্রান্তমতে পতিত হব যা অনুসারে খ্রিষ্ট ছিলেন সাধারণ একটি মানুষ যাকে দত্তক দ্বারাই ঐশপর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল।

(খ) সাম ৬৮:১৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) প্রেরিত ২:৩৩। রুফিনুস বাইবেলের এ বচন সংক্ষেপিত করেন।

(ঘ) সাম ২৪:৭-৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) সাম ৪৭:৬।

(চ) আমোস ৯:৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ছ) সাম ১৮:১১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৩২ (ক) এক্ষেত্রে যেরুশালেমের সাধু সিরিলের কথা স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়; ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে তিনি বলেছিলেন যে, 'পুত্র কেবল আপন ক্রুশ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পরেই

পিতার ডান পাশে আসীন হতে শুরু করেছিলেন। কেননা সেই পুত্র আসনটা ক্রম অগ্রগতি দ্বারা অর্জন করেননি, বরং তিনি যা, তা জোরেই তিনি পিতার সঙ্গে আসীন যেইভাবে তিনি অনাদিকাল থেকে জনিত’, ইত্যাদি (ধর্মশিক্ষা ১৪:২৭-৩০)। এতে যেরুশালেমের সাধু সিরিল খ্রিষ্টের অনাদিকালীন ও চিরকালীন আসনগ্রহণের উপরেই জোর দেন। কিন্তু রুফিনুস বিষয়টা আরও সূক্ষ্মতর ভাবে ব্যাখ্যা করেন (ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া টীকা ৩১ক এর উপরে ভিত্তি করে); অর্থাৎ তিনি দু’টো বিষয়ের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, (১) সেই ঐশবাণী যিনি অনাদিকালীন ও চিরকালীন অস্তিত্বমণ্ডিত, ও (২) সেই মাংস-হওয়া-বাণী যিনি পিতার ডান পাশে আসীন। এভাবে রুফিনুস সিরিলের চেয়ে ঐশবাণী রহস্যটাকে সূক্ষ্মতর রূপে উপস্থাপন করেন।

(খ) সাম ৯৩:২।

(গ) ফিলি ২:১০-১১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) সাম ১১০:১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) মথি ২২:৪৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(চ) মথি ২৬:৬৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ছ) ১ পি ৩:২২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(জ) এফে ১:২০-২১ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৩৩ (ক) সাম ১১২:৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ১০:২৮। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

৩৪ (ক) মালা ৩:১-৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(খ) দা ৭:১৩-১৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) লুক ১:৩৩। এমনটা হতে পারে যে, এক্ষেত্রে রুফিনুস অন্যমনস্ক ছিলেন, কেননা ‘তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন’ সূত্রটা আকুইলেইয়ার বিশ্বাস-সূত্রে স্থান পায় না। যাই হোক, সূত্রটা আঞ্চিরার সেই মার্কেল্লসকে লক্ষ করে যার অভিমতে খ্রিষ্টের রাজ্যের একদিন অন্ত হবেই; সেই মার্কেল্লস নিজের অভিমত করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের ১ম পত্রের উপর দাঁড় করাত যা অনুসারে ‘যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে।’ এ ভ্রান্তমতের বিপক্ষে যেরুশালেমের সাধু সিরিল উপযোগী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন (ধর্মশিক্ষা ১৫:২৭…)।

(ঘ) যোহন ৫:৪৩ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) মথি ২৪:১৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(চ) ১ থে ২:৩-৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ছ) ১ থে ২:৮-৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(জ) ১ থে ২:১১-১২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঝ) মথি ২৪:২৩-২৪। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

(ঞ) মথি ২৪:২৭। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

(ট) মথি ২৫:৩২। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

(ঠ) ২ করি ৫:১০ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ড) রো ২:১৫-১৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৩৫ (ক) খ্রিষ্ট সংক্রান্ত নিজের দীর্ঘ ব্যাখ্যাকে রুফিনুস এমন 'প্রতিবন্ধক' বলে চিহ্নিত করে যা বিশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা 'বিলম্বিত' করেছে। এমনটা হতে পারে যে, সম্ভবত রুফিনুস মনে মনে এমন সংক্ষিপ্তই একটা বিশ্বাস-সূত্র সমর্থন করতেন যে বিশ্বাস-সূত্র সুসমাচারে প্রভুর দেওয়া আদেশ অনুযায়ী তথা, 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও' (মথি ২৮:১৯)। অর্থাৎ এমন সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস-সূত্র যা বাপ্তিস্ম দানকালে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ব্যবহার করা হত, যেমন, আমি পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমি তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি। কেননা, তাঁর নিজের ব্যাখ্যা অনুসারে, এ তিনটে মূল বিষয় ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয় ভ্রান্তমতগুলো প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কালক্রমে যোগ করা হয়েছিল।

৩৬ (ক) ২ তি ৩:১৬। পুরাতন নিয়ম যে ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত, তা যোসেফুস ও ফিলো নামক ইহুদীদের দ্বারাও স্বীকৃত ছিল। নূতন নিয়ম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শতাব্দীর আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু থেওফিলুস ও সাধু ইরেনেউস স্পষ্টভাবে বলেন, ঊর্ধ্ব থেকে আগত পবিত্র আত্মার পরাক্রমে পরিবৃত হওয়ার পর প্রেরিতদূতেরা সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন; সেই একই দ্বিতীয় শতাব্দীর মুরাতরি পাণ্ডুলিপি-খণ্ডও এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বলে যে, প্রভু যিশুর জীবন সংক্রান্ত প্রধান ঘটনাসমূহ 'সেই একমাত্র ও প্রধান [পবিত্র] আত্মা দ্বারা' সকল সুসমাচার পুস্তকে ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) যাঁরা শাস্ত্র সংক্রান্ত বাইবেল-পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তালিকা সঙ্কলন করেছিলেন, সেই 'পূর্বপুরুষদের' মধ্যে যাঁদের লেখা সম্পর্কে রুফিনুস সম্ভবত অবগত ছিলেন, তাঁরা হলেন, অরিগেনেস, যেরুশালেমের সাধু সিরিল (ধর্মশিক্ষা ৪:৩৩-৩৬), সাধু আথানাসিউস ও সাধু যেরোম।

৩৭ (ক) 'পারালিপমেন' গ্রীক শব্দের অর্থ হলো 'বাদ পড়া', সম্ভবত একারণে যে, এপুস্তকগুলোতে এমন বিষয় বর্ণিত যেগুলো রাজাবলি পুস্তকগুলো থেকে বাদ পড়েছিল (অর্থাৎ রাজাবলি পুস্তকগুলোতে উল্লিখিত নয়)।

(খ) ‘দিবসগুলো’ এর অর্থ ‘তালিকা’, এমন তালিকা যা সবকিছু সংক্রান্ত যেমন ঘটনা, বংশ বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়। এ পুস্তকাদি বাংলায় ‘বংশাবলি’ বলে পরিচিত।

(গ) রুফিনুস যে নূতন নিয়মের অধিকাংশ লেখকগণ প্রেরিতদূত বলে চিহ্নিত করেন, তাতে আমরা বুঝি, সেকালে নূতন নিয়মের কোন্ কোন্ পুস্তক প্রামাণিক কিনা, তা লেখকের প্রৈরিতিক অধিকারের উপর অনেকটা নির্ভর করত।

(ঘ) ‘কানুন অনুযায়ী তালিকা’। বাইবেলের পুস্তকগুলো সম্পর্কে ‘কানুন অনুযায়ী তালিকা’ শব্দটা প্রথম বারের মত সাধু আথানাসিউস দ্বারা আনুমানিক ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবহৃত হয়। তা দ্বারা সেই পুস্তকগুলোকে নির্ধারণ করা হয় যেগুলো পবিত্র শাস্ত্র বলে স্বীকৃত। ভাষাগত দিক দিয়ে গ্রীক ভাষার শব্দটা হলো κανών (লাতিন ভাষায় ‘canon’) যার অর্থ দাঁড়ায় মাপকাঠি, মানদণ্ড ইত্যিাদ সমরূপ শব্দ, অর্থাৎ নিয়ম বা কানুন। তাই যে পুস্তকগুলো বাইবেলের প্রামাণিক পুস্তক বলে পরিগণিত ছিল, সেগুলো কানুন অনুযায়ী পুস্তক বলে অভিহিত ছিল।

৩৮ (ক) ‘মণ্ডলীগত’ পুস্তকগুলো। বাইবেলের পুস্তকগুলো ক্ষেত্রে ‘মণ্ডলীগত’ শব্দটা রুফিনুসের আগে কোন উল্লেখ নেই। মনে হচ্ছ, রুফিনুস পুস্তকগুলোকে ‘কানুন অনুযায়ী’, ‘মণ্ডলীগত’ ও ‘আপক্রিফুস’ এ তিনটে শ্রেণিতে বিভক্ত করতে চেষ্টা করছিলেন।

(খ) ‘এক্লেসিয়াস্তিকুস’। এ লাতিন শব্দের অর্থ হলো ‘মণ্ডলীবিশেষ’, কেমন যেন পুস্তকটা মণ্ডলী সংক্রান্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে প্রাধান্যের অধিকারী।

(গ) ‘পালক’ বা ‘হের্মাস’ বলে অভিহিত পুস্তক (যা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত) নূতন নিয়মের শেষ পুস্তকগুলোর পর পরেই লেখা হয়েছিল ও খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, অনেকেই, ও সেই অনেকের মধ্যে প্রখ্যাত সেই সাধু ইরেনেউসই একজন, পুস্তকটা কানুন অনুযায়ী পুস্তকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত বলে সমর্থন করতেন।

(ঘ) ‘দু’টো পথ’। প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখাগুলোর মধ্যে দু’টো পুস্তক রয়েছে যেগুলো ‘দু’টো পথ’ বিষয়টা উপস্থাপন করে, তথা ‘দিদাখে’ (১-৬ অধ্যায়) ও ‘বার্নাবাসের পত্র’ (১৮-২০ অধ্যায়)। রুফিনুস এখানে সম্ভবত ‘দিদাখে’রই কথা বলছেন।

(ঙ) ‘পিতেরর বিচার’ পুস্তক সম্পর্কে আজকালে কোন খবর নেই। সম্ভবত পুস্তকটা হারিয়ে গেছে।

(চ) ‘আপক্রিফুস’ শব্দটা গ্রীক ἀπόκρυφος ও লাতিন apocryphus থেকে আগত শব্দ যার অর্থ ‘গুপ্ত’। খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভবের আগে সেই পুস্তকগুলো ‘আপক্রিফুস’ বলে চিহ্নিত হত যেগুলো এমন গুপ্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করত যা সাধারণ লোকদের কাছে প্রকাশিত হওয়ার নয়। কালক্রমে এমন পুস্তকগুলো ‘আপক্রিফুস’ বলে অভিহিত হতে লাগল যেগুলো উপাসনা কালে ব্যবহার্য না হয়েও তবু ব্যক্তিগত ভাবে ভক্তি-পুস্তক হিসাবে ব্যবহার্য। অবশেষে, ‘আপক্রিফুস’ পুস্তক বলতে এমন পুস্তক বোঝাল যেগুলোর বিষয়বস্তু মিথ্যা, জাল-করা ও ধর্মতত্ত্ব বিরুদ্ধ। রুফিনুস ‘আপক্রিফুস’ শব্দটা এ শেষ অর্থে ব্যবহার করেন।

৩৯ (ক) এফে ৫:২৭ দ্রঃ।

(খ) বালেন্তিনুস মিশরে জন্মগ্রহণ করে সময়মত রোমে গিয়ে মণ্ডলী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। তারপর সে সাইপ্রাস দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে সেখানে, ১৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করে। তার ধর্মশিক্ষা গ্রীক জ্ঞানমার্গ ও এমন কাল্পনিক ধারণাগুলো দ্বারা চিহ্নিত ও প্রভাবান্বিত যেখানে খ্রিষ্টের ভূমিকা এলোমেলো ভাবে স্থান পায়। বহু শিষ্য জড় করার তার কার্যক্ষমতা সর্বস্বীকৃত।

(গ) সাম ২৬:৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) পরমগীত ৬:৯; বচনটা অপূর্ণাঙ্গ ভাবে উদ্ধৃত।

(ঙ) সাম ২৬:৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য। লক্ষণীয় বিষয়, 'আমি মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে বসি না' হিব্রু বচনটা লাতিন পাঠ্যে 'আমি অসারের সভায় বসি না' বলে অনুবাদ করা হয়। রুফিনুসের ধারণায় ভ্রান্তমতপন্থীদের নকল মণ্ডলীগুলোই হলো সামসঙ্গীতে উল্লিখিত সেই 'অসারের সভা'।

(চ) মার্কিওন পোন্তস অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে ১৪০ সালে রোমে আসে। তার দৃষ্টিভঙ্গিই এরূপ, যে ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে প্রকাশিত, সেই ঈশ্বর জগৎ ও মানুষের স্রষ্টা ছাড়া এমন নির্মম অত্যাচারী শাসক যিনি বাধ্যতা, যজ্ঞ ও বিধানভিত্তিক কর্ম আদায় করেন, ফলে সেই ঈশ্বর যিশুর প্রকাশিত ঈশ্বর থেকে আলাদা ধরনের, কেননা যিশু এমন ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছিলেন যিনি দয়াবান ও মানবপ্রেমিক পিতা যিনি কেবল বিশ্বাস দাবি করেন। এভিত্তিতে মার্কিওন পুরাতন নিয়ম বর্জন করেছিল, ও নূতন নিয়মের শুধু লুক রচিত সুসমাচার ও প্রেরিতদূত পলের প্রথম দশটা পত্র সমর্থন করত; এমনকি এ লেখাগুলোতে যা কিছু ইহুদী মনোভাব অনুযায়ী মনে হচ্ছিল, তাও বর্জন করেছিল। মার্কিওনকে ১৪৪ সালে মণ্ডলীচ্যুত করা হয়; সে অনুমানিক ১৬০ সালে মৃত্যুবরণ করে।

(ছ) প্রেরিতদূত পল রোমীয়দের ও গালাতীয়দের কাছে পত্রে যে ইহুদীপ্রথা সমর্থনকারী খ্রিষ্টিয়ানদের বিপক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন, এবিওনপন্থীরা সম্ভবত ছিল তাদের উত্তরসূরী, কেননা এরাও বিধানের কঠোর পালন (পরিচ্ছেদন ইত্যাদি প্রথা পালন) সমর্থন করছিল ও যিশুকে কেবল মশীহ বলে মান্য করছিল, অর্থাৎ যিশু যে ঈশ্বর ও ঈশ্বরজনিত পুত্র তা অস্বীকার করছিল। যাই হোক, রুফিনুস যে 'এবিওন' এর কথা বলছেন তাকে তিনি একটা প্রকৃত ব্যক্তি মনে করছিলেন; কিন্তু তা নয়, সম্ভবত এবিওন নামক তেমন ব্যক্তি ছিল না; প্রকৃতপক্ষে 'এবিওন' একটা হিব্রু শব্দ যার অর্থ 'নিঃস্ব', এবং এদলের সদস্যরা নিজেদের 'এবিওনীয়' বলে চিহ্নিত করছিল।

(জ) যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষা মানি বলেও পরিচিত মানিখেউসের জীবন, ধর্মীয় অভিমত ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করে। যাই হোক, মানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিওনপন্থী ছিল, ও নানা মতের মধ্যে এটা সমর্থন করত যে, জীবনধারণে যারা 'মনোনীতজন' পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, তারা মৃত্যুর পরে কঠোর শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ার

অধীন হবে। মানির ভ্রান্তমত মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল, ও সেই ভ্রান্তমতে নাম করা ব্যক্তিত্বও যোগ দিয়েছিল; তাদের মধ্যে সাধু আগস্তিন নিজেই উল্লেখযোগ্য, তিনি যৌবনকালে মানিপন্থী হয়েছিলেন।

(ঝ) সামোসাতায় জন্মগ্রহণ করে পল ২৬০ সালে আন্তিওখিয়ার বিশপত্ব পদে উন্নীত হয়ে ২৬৮ সালে আন্তিওখিয়া ধর্মসভায় ভ্রন্তমতপন্থী বলে দণ্ডিত হয়। সে-ই তৃতীয় শতাব্দীর প্রধান ভ্রান্তমতপন্থী বলে পরিগণিত। সে এমন শিক্ষা দিত যে, কেবল পিতা ঈশ্বরই প্রকৃত ঐশসত্তার অধিকারী; বাণী-ঈশ্বর পিতার উচ্চারিত বাক্য হওয়ায় পিতার চেয়ে আলাদা কোন ব্যক্তি নন। ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিষ্টের অস্তিত্ব মারীয়ার গর্ভে পবিত্র আত্মা দ্বারা সূচিত হয়েছিল; অনাদি অনন্ত বাণী-ঈশ্বর সেই খ্রিষ্টে বসবাস করা সত্ত্বেও খ্রিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক ছিলেন, এবং খ্রিষ্ট ক্রমবর্ধমান উন্নতিক্রমেই ঐশমর্যাদা লাভ করেছিলেন।

(ঞ) ফতিনুস আঞ্চিরায় (তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আঙ্কারা) জন্মগ্রহণ করে ৩৪৩ সালে সির্মিউমের বিশপ পদে উন্নীত হয়, কিন্তু তার ধর্মশিক্ষা ৩৪৪ সালে আন্তিওখিয়া ধর্মসভায় ভ্রান্তমত বলে চিহ্নিত ও দণ্ডিত হয়, কেননা সেই ভ্রান্তমত অনুসারে খ্রিষ্ট অলৌকিক গর্ভধারণের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ একটা মানুষ ছিলেন যিনি নৈতিক আচরণের ফলেই ঐশপর্যায় উন্নীত হয়েছিলেন।

(ট) এউনোমিউস আনুমানিক ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে উদ্ভূত আরিউসপন্থীদের একটা দলের নেতা ছিল। সেই ভ্রান্তমত এশিক্ষা সমর্থন করত যে, ঈশ্বরের পুত্র প্রকৃতপক্ষে একটা সৃষ্টজীব মাত্র ও পিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, যদিও নিজের মানব অস্তিত্বের শুরু থেকেই ঐশমর্যাদার অধিকারী। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সে সম্ভবত এমন ধারণা সমর্থন করত যা অনুসারে পবিত্র আত্মার সত্তা ছিল পিতা ও পুত্রের সত্তা থেকে ভিন্ন; এমনকি, তার মতে পবিত্র আত্মা ছিলেন একটা সৃষ্টজীব মাত্র যিনি পুত্রের কর্মের ফল। যখন রুফিনুস বলেন যে এউনোমিউসের মতে পবিত্র আত্মা পুত্রের 'প্রতিনিধি' মাত্র, তখন আমাদের স্মরণ করা উচিত যে 'প্রতিনিধি' শব্দটা লাতিন অর্থ অনুসারে নিম্নশ্রেণির একটা কর্মচারী বুঝাত, এমন কর্মচারী যে রাজার পক্ষে কর-আদায় করত। এজন্য পবিত্র আত্মা যে পুত্রের 'প্রতিনিধি' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণির কর্মচারী মাত্র, তা রুফিনুসের কাছে অসহ্য অপমানজনক একটা বর্ণনা।

(ঠ) রুফিনুস 'প্নেউমাতোমাখী' নামক এমন ভ্রান্তমতপন্থীদের কথা উপস্থাপন করছেন যারা পবিত্র আত্মাকে সৃষ্টজীব মাত্র শুধু নয়, ঈশ্বরের স্বর্গীয় সেবাকর্মীদের একজন বলে গণ্য করত, যদিও তারা এ মেনে নিত যে, সেই সেবাকর্মীদের চেয়ে পবিত্র আত্মা সামান্য ঊর্ধ্বতর পর্যায়ের সেবাকর্মী। 'প্নেউমাতোমাখী' লাতিন শব্দের অর্থ, আত্মা-সংগ্রামী।

(ড) মথি ২৮:১৯। রুফিনুস সংক্ষেপিত একটা পাঠ্য অনুসারে বচনটা ব্যবহার করেন।

(ঢ) এখানে রুফিনুস আপল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতের শিক্ষা উপস্থাপন করছেন। আপল্লিনারিউস আনুমানিক ৩১০ সালে জন্মগ্রহণ করে ৩৯০ সালে মৃত্যুবরণ করে। আপল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতের ফলে এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিশু মানবস্বরূপ ধারণ করলেন ঠিকই, কিন্তু তা

সম্পূর্ণরূপে আপন করেননি। এজন্য আপল্লিনারিউসের শিক্ষা ৩৬২ সালে আলেক্সান্দ্রিয়ার ধর্মসভায়, ৩৭৪, ৩৭৬ ও ৩৮০ সালে রোমের ধর্মসম্মেলনত্রয়ে, ও ৩৮১ সালে কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভায় ভ্রান্তমত বলে দণ্ডিত হয়।

(ণ) দনাতুসপন্থীদের সৃষ্ট মণ্ডলীবিচ্ছেদ উত্তর আফ্রিকার সর্বস্থানে এমন তীব্রতার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে যে, বহু বছর ধরে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে রোম-পন্থীর বিশপের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দনাতুসপন্থী আর এক বিশপ থাকতেন।

(ত) রুফিনুসের বর্ণনা অনুসারে এ বোঝা যায় যে, তিনি যার কথা বলছেন, তার নাম নভাতুস নয় বরং নভাতিয়ানুস। এই নভাতিয়ানুস যে মণ্ডলীবিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, তা বহু বছর ধরে উত্তর আফ্রিকার সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

(থ) রুফিনুস এখানে যে সমস্ত ভ্রান্তমতের কথা বলছেন, সেসময় সেই সমস্ত কিছু দ্বিতীয় শতাব্দীর অরিগেনেস নামক প্রখ্যাত লেখকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত; কিন্তু আজকালে আমরা জানি, অরিগেনেস একাই যে এসমস্ত ভ্রান্তমতের জন্য দায়ী, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে, 'তেমন মানুষই যদি বা থাকে' ও 'যাদের বিষয়ে নাকি বলা হয়' বলায় রুফিনুস নিজেই বুঝাতে চান, তাঁর বিবেচনায় ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত ও অসঙ্গত পর্যায়ে উঠেছিল।

(দ) বিশ্বাস-সূত্রের 'পাপের ক্ষমা' বচনটা আদিতে সেই পাপের ক্ষমা লক্ষ করত যা মানুষ বাপ্তিস্ম নেওয়ার সময়ে লাভ করে, সেইভাবে যেভাবে 'পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের এক-বাপ্তিস্মে [বিশ্বাস করি]' বলায় প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাস-সূত্র স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। কিন্তু কালক্রমে মণ্ডলী পাপক্ষমা তত্ত্বটা শুধু বাপ্তিস্মে সীমাবদ্ধ না রেখে পুনর্মিলন (পাপস্বীকার) সাক্রামেন্তেও আরোপ করল।

৪০ (ক) প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয়রা মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দী থেকেই পাপক্ষমা তত্ত্বটার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল। এর প্রমাণ স্বয়ং অরিগেনেস, তিনি এবিষয়ে অভিযোগকারী একজন বিজাতীয় দার্শনিকের যুক্তি খণ্ড করেছিলেন।

(খ) এবিষয়ে রুফিনুসের শিক্ষা এ: যেহেতু নৈতিক অপকর্ম মানুষের ইচ্ছাতেই স্থিত, সেজন্য অপকর্মটা তখনই মাত্র উচ্ছেদ করা যাবে যখন সেই মন্দ ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটবে।

৪১ (ক) 'মাংসের পুনরুত্থান' হল আকুইলেইয়ার ও রোমের বিশ্বাস-সূত্রের শেষ বচন। অন্য দিকে প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো 'মাংসের পুনরুত্থান' এর পর 'অনন্ত জীবন' এর কথাও যোগ দিত। কালক্রমে রোমের বিশ্বাস-সূত্রও বচনটা গ্রাহ্য করবে যেভাবে সাধু কায়েসারিউসের লেখা প্রমাণ করে (উপরে, ভূমিকা দ্রঃ)। যাই হোক, 'মাংসের পুনরুত্থান' না বলে নূতন নিয়ম ও সেকালের নানা লেখকগণ 'মৃতদের পুনরুত্থান' এর কথা বলে। তবে কেন বিশ্বাস-সূত্রগুলো মৃতদের পুনরুত্থান না বলে মাংসেরই পুনরুত্থানের কথা বলে? সম্ভবত উত্তর এ: সেসময় নানা স্থানে এমন নানা অভিমত প্রচলিত ছিল যা মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা করত না বা তা একেবারে অস্বীকার করত; বাস্তবিকই একথার পর পরেই রুফিনুস

ভ্রান্তমতপন্থী সেই বালেন্তিনুস ও মানির কথা উল্লেখ করেন যারা এসমস্ত কিছু অস্বীকার করছিল। তাই সেকালের ঐশতত্ত্ববিদগণ ‘মাংসের পুনরুত্থান’ কথাটাই বেছে নিয়েছিলেন।

(খ) ইশা ২৬:১৯ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) দা ১২:২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) মার্ক ১২:২৬-২৭

(ঙ) মথি ২২:৩০ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৪২ (ক) ১ করি ১৫:৩৬-৩৮ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৪৩ (ক) ক্রুশচিহ্নে নিজেদের চিহ্নিত করা খুই প্রাচীন একটা প্রথা। তের্তুল্লিয়ানুস (১৫৫-২২০) এবিষয়ে লিখেছিলেন, ‘যেকোন কর্মের শুরুতে বা কর্মের অগ্রগতিতে, যখন প্রবেশ করি বা বাইরে যাই, যখন পায়ে জুতো বা গায়ে পোশাক দিই, যখন স্নান করি, খাবার টেবিলে বসার সময়ে বা বাতি জ্বালাবার সময়ে, যখন শুই বা বসি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডেই আমরা কপাল ক্রুশচিহ্নে চিহ্নিত করি’ (সৈনিকের মুকুট ৩)।

(খ) ১ করি ১৫:১৩-১৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) ১ করি ২০-২৪ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) ১ করি ১৫:৫১-৫২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) ১ থে ৪:১৩-১৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৪৪ (ক) এজে ৩৭:১২ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোব ১৪:৭-১০ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোব ১৪:১৪ ক প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) যোব ১৪:১৪ খ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য। রুফিনুসের কাছে এ বচন স্পষ্টভাবেই মানুষের পুনরুত্থান লক্ষ করে।

(ঙ) যোব ১৯:২৫ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

৪৫ (ক) ১ করি ১৫:৫৩।

(খ) রো ৬:৯।

৪৬ (ক) ‘উপরে’, অর্থাৎ ৩৩ অধ্যায়।

(খ) ১ থে ৪:১৩-১৭।

(গ) ফিলি ৩:২১।

(ঘ) এফে ২:৬ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) মথি ১৩:৪৩ ও দা ১২:৩ দ্রঃ।

(চ) ১ করি ১৫:৪৪।

৪৭ (ক) আদি ২:৭ প্রাচীন লাতিন পাঠ্য।

(খ) দা ১২:২। বাইবেলের বচনটা সূক্ষ্মভাবে উল্লিখিত নয়।

৪৮ (ক) এপ্রসঙ্গে রুফিনুস ৩৫ অধ্যায়ে লিখেছিলেন, 'ব্যক্তিত্রয়কে যেন নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, সেজন্য সম্পর্ক সংক্রান্ত শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন, যার ফলে প্রথম ব্যক্তি পিতা বলে উপলব্ধ, যাঁর কাছ থেকে সবকিছু আগত ও যাঁর কোনও পিতা নেই; দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন পুত্র যেহেতু তিনি পিতা থেকে সঞ্জাত; এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন পবিত্র আত্মা যেহেতু তিনি ঈশ্বরের মুখ থেকে উদ্গত ও সমস্ত কিছু পবিত্রিত করে থাকেন।'

(খ) ৪০ অধ্যায় শেষেও রুফিনুস এ বলে ব্যাপারটা তুলে ধরেছিলেন, 'এভাবে এমনটা দেখা যাবে যে, আমাদের বিশ্বাস ও প্রকৃতিগত যুক্তির মধ্যে কোনও বিরোধিতা নেই।' সেই অনুসারে এই অধ্যায়ে 'ঐশস্বধীনতা'র কথা তুলে ধরে রুফিনুস বলতে চান, বিধর্মী তর্কবিদেরা মানবযুক্তি হাতিয়ার করে যাই বলুক না কেন, ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।